অন্ধকারের প্রতিবিম্ব

সুশান্ত কুমার বিশ্বাস

লিইবার ফিয়ের৷

।। এক ।।

" We have no way of conveying knowledge of a completed set of simultaneous processes except by describing then successively; and thus it happens that all our accounts err in the first instance in the direction of onesided simplification and must wait till they can be supplemented, resconstructed and so set right."

সমুদ্রের সাথে মৈনাকের যোগাযোগটা বহু পুরোনো। বহু গভীর। বহু .... বহু .... বহু। ঠিক কোন শব্দ ব্যবহার করলে সম্পর্কটা বোঝানো যাবে মৈনাক নিজেও জানে না। আপনি যদি ওকে জিজ্ঞাসা করেন ও বলবে 'পুরোনো, যেমন আমার রক্তের স্বাদটা'। ব্যাপারটা কেমন অসংলগ্ন শোনাল, তাই না? আসলে হয়েছিল কী, ষোলো বছর বয়সে মৈনাক একবার পেনসিল কাটার ছুরি দিয়ে তার বাঁ কবজির শিরাটা কেটে দিয়ে অজ্ঞান হওয়ার আগের মুহূর্ত পর্যন্ত রক্তটা চেটে চেটে খেয়ে দেখেছিল যে তার রক্তের স্বাদটা নোনা। তারপর জ্ঞান হওয়া এবং সুস্থ হওয়ার পরে সে বাবার সঙ্গে কোনো এক সমুদ্র সৈকতে বেড়াতে যায়। সেখানে সমুদ্রে নেমে আঁশটে নোনা জলের স্বাদ তার জিভে লাগায় সে সমুদ্রের সঙ্গে তার রক্তের কোনো একটা সামঞ্জস্য খুঁজে পেয়েছিল। সে যাক। যে কথা বলছিলাম। সমুদ্রের সাথে মৈনাকের সখ্যতা অনেক পুরোনো। মানে যেমন রক্তের স্বাদটা। সেই কারণেই বোধহয় মৈনাক বছরের মধ্যে অন্তত একটা মাস কোনো না-কোনো সমুদ্র সৈকতে কাটাতে আসে। আজ কালাঙ্গুট-এর ঢেউতে ভাসতে ভাসতে মৈনাক আবার তার রক্তের প্লাবন অনুভব করল।

মৈনাক কিন্তু সাঁতারে বেশ অপটু। তবুও সমুদ্রকে সে এতটাই চেনে, জানে, যে

সে নির্দ্বিধায় ভাসতে ভাসতে বহু দূর চলে যায়। বহু দূর, যেখানে অনেক নিপুণ সাঁতারুও যেতে সাহস করবে না। এবং আশ্চর্য, সে সময় মৈনাকের মনে কোনো ভয় বা অজানা আশঙ্কার কণাটুকুও থাকে না। আপনি যদি ওকে জিজ্ঞাসা করেন, 'তোমার ভয় লাগে না?' ও হেসে বলবে, 'সমুদ্রকে ভয় কীসের? ও তো মৃত্যুর চেয়েও সরল।' আবার কথাটা কেমন অসংলগ্ন শোনাল তাই না? আসলে সাধারণ লোক মৃত্যুকে যতই ভয় পাক, মৈনাক মৃত্যুকে খুব কাছ থেকে দেখে জেনেছে যে মৃত্যুতে আর সমুদ্রে যতই রহস্য থাকুক না কেন, কাছে গেলে দুজনেই সরল, সমান্তরাল। তাই আর যা কিছুতেই হোক সমুদ্রকে নিয়ে মৈনাকের কোনো ভয় বা আশঙ্কা নেই। মৃত্যুও যেমন প্রেডিক্টেবল... ওর কাছে সমুদ্রও তেমন প্রেডিক্টেবল।

নীচে সোনা রঙের বালি। পান্না রঙের সমুদ্রে মোড়া সূর্যের আলোয় এক বৈদুর্য বিকিরণে মহীয়ান। মৈনাক পরম শান্তি নিয়ে তাকে সারা শরীর দিয়ে ছুঁল। মনে মনে বলল, 'হে স্রষ্টা, আগামী জন্মে আমাকে একটা ডলফিন করে পাঠিয়ো। আমি সমুদ্র তরঙ্গে আন্দোলিত হব। মাছদের সাথে কথা বলব। অতল জলরাশি থেকে পৃথিবীর বনাঞ্চলকে দেখব, আর... সুন্দর দুটো পা কেমন মাছের লেজের মতো তির তির করে এগিয়ে যাচ্ছে। পা দুটো বাদামি লম্বা আর মেদবর্জিত। সুললিত ভাস্কর্যের মতো জঙ্ঘায় এসে মিলেছে। হাত দুটোও সুন্দর। সুডৌল অথচ সুগঠিত। কেমন ছন্দের সাবলীলতায় জল কেটে এগিয়ে যাচ্ছে। মৈনাকের মাথায় একটা দুষ্টুবুদ্ধি খেলে গেল। আচ্ছা, মেয়েটিকে একটু চমকে দেওয়া যাক। মেয়েটি কিছু দূর সাঁতারে গিয়ে আবার ফিরে আসছে। মৈনাক ডুবন্ত অবস্থায় অপেক্ষা করে রইল কখন মেয়েটির শরীরটা ঠিক ওর মাথার ওপর পৌঁছাবে। মৈনাক নিশ্চিত, মেয়েটি ওকে লক্ষই করেনি। মেয়েটি ওর মাথার কাছে পৌঁছতেই মৈনাক ডুবন্ত অবস্থায় ডান হাতটা বাড়িয়ে পাঁচ আঙুল দিয়ে মেয়েটির বাঁ পায়ের ডিমে একটা হাল্কা খিমচি কাটল। মেয়েটি এক ঝটকায় পাটা সরিয়ে নিয়ে সাঁতার থামিয়ে দিল। দু'মুহূর্তের নির্বাক আতঙ্ক নিয়ে সে তার চারধারের জলরাশিকে একবার জরিপ করল। তারপরই একটা তীক্ষ্ণ, ভয়ার্ত চিৎকার তার গলা দিয়ে বেরিয়ে এল। মৈনাক যা আন্দাজ করেছিল ঠিক তাই। সমুদ্রের জল, দূর থেকে যতোই লোভনীয় হোক না কেন তাকে নিয়ে সাধারণত একটা অজানা ভয় বা আশঙ্কা মানুষের থাকেই। আর তাদের এই আশঙ্কাটা চতুর্গুণ বেড়িয়েছে কিছু জনপ্রিয় বিদেশি ছায়াছবির দৌলতে। এই মেয়েটিও তার ব্যতিক্রম নয়। সাঁতারে সে যতই পটু হোক না কেন, সমুদ্রকে নিয়ে একটা চাপা ভয় বা আশঙ্কা তার আছেই। জলের নীচে মৈনাককে দেখতে না পেয়ে সে নিশ্চয়ই হাঙ্গর বা পিরনহা এই জাতীয়

কিছু একটা ভেবে আঁতকে উঠেছে। তার আতঙ্ক প্রশমিত করার জন্যই মৈনাক জল থেকে মাথা তুলেই আঁতকে ওঠা মেয়েটার মুখের দিকে চেয়ে হো হো করে হাসিতে ফেটে পড়ল। ভয় আর আতঙ্কটা কেটে যেতেই মেয়েটি তার স্বাভাবিক গাম্ভীর্যে ফিরে খানিকটা বিরক্ত হয়েই বলল, 'Don't you feel that it was a very stupid joke?' মৈনাক ওর এই বিরক্তিতে আরও জোরে হেসে উঠল তারপর বলল, ''You are a good swimmer; but I think more wellacquianed with swimming pools than the sea'' 'ইউ নো শার্কস আর এ ডিপ সি ক্রিয়েচার। দে নেভার ভেঞ্চার ইন দিজ শ্যালো ওয়াটারস। কাম ওন, লেটস গো ফর এ সুইম। লেটস সি হাউ ফার উই ক্যান গো।' মেয়েটির বিরক্তিতে বিন্দুমাত্র পরিবর্তন হল না। গম্ভীর থেকেই বলল, 'আমার আর ভালো লাগছে না।' মৈনাক ওর প্রস্তাবে সম্মতি জানিয়েই মেয়েটির সঙ্গে পাড়ের দিকে সাঁতার কাটতে শুরু করল।

কালাঙ্গুট বিচে ঝলমলে রোদ আর অগুনতি দেশি-বিদেশি ভ্রমণার্থীর আনাগোনা। বিচের ওপর ছড়ানো বেশ কিছু গদি মোড়া আরাম কেদারা। মেয়েটি তার একটায় গিয়ে শরীর এলিয়ে দিল। মৈনাক ওর মেজাজটা পরখ করার জন্য জিজ্ঞাসা করল, 'হাউ অ্যাবাউট ও ড্রিংক...?' মেয়েটি এবার অল্প হাসল। তারপর বিদেশি কায়দায় কাঁধ ঝাঁকিয়ে বলল, 'ফ্রেশ লাইম বা অরেঞ্জ জুস চলতে পারে, অবশ্য আছে বলে মনে হয় না', বলে পেছনের পানীয় বিক্রি করা ছাউনিগুলোর দিকে চোখের ইঙ্গিত করল। মৈনাক দু'পা এগিয়ে ছাউনিগুলোর দিকে হাত তুলে ইশারা করতেই হাফ প্যান্ট আর টি-শার্ট পরা একটা ছেলে এগিয়ে এল। মৈনাক বলল, 'মেমসাবকে লিয়ে এক ফ্রেশ লাইম, আর মেরে লিয়ে এক বিয়ার।' ছেলেটি মাথা হেলিয়ে সম্মতি জানানোর পর আবার জিজ্ঞাসা করল, 'স্ন্যাক্স, কুছ লিজিয়েগা?' মৈনাক মেয়েটার দিকে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাতেই সে বলল, 'ফ্রুট স্যালাড।' মৈনাক ছেলেটির দিকে তাকিয়ে বলল, 'উনকে লিয়ে এক ফ্রুট স্যালাড, আর মেরে লিয়ে এক প্লেট ফ্রায়েড ম্যাকারেল।' ছেলেটা দ্রুত ছাউনির দিকে ছুটে যেতেই মৈনাক মেয়েটির দিকে ফিরে বলল, 'আমি এখানে বসতে পারি তো?' বলে মেয়েটির পাশের আরাম কেদারাটা দেখাল। মেয়েটি প্রত্যুত্তরে হেসে বলল, 'আমি লোলা, লোলা বারগেন্ডি।' মৈনাক আরাম কেদারায় শরীর এলিয়ে দিতে দিতে অত্যন্ত রহস্যঘন হেসে বলল, 'আমি ম্যাক।' তারপর লোলার দিকে ফিরে বলল, 'আমার আন্দাজ যদি বেঠিক না হয় আপনি গোয়ারই মেয়ে।' লোলা এবার খিলখিল করে হেসে মাথা ঝাঁকিয়ে বলল, 'উহু একদম ভুল। আমার বাবা-মা কেরলের, আমি অবশ্য এখন থাকি বোম্বাইয়ে। ... তারপর হাসি

থামিয়ে মৈনাকের দিকে ফিরে বলল, 'আর আপনি...?' মৈনাক এক মুহূর্ত ভেবে বলল, 'আমার জন্ম কলকাতায়। বাবা-মা এখনও কলকাতাতেই থাকেন। আমি থাকি দিল্লিতে, চাকরি করি দিল্লির ময়ূর শেরাটন হোটেলে ... লবি ম্যানেজারের পদে। আমার বয়স ছত্রিশ এবং আমি এখনও অবিবাহিত ...' বলেই তার স্বাভাবিক সরল হাসি হাসল। লোলাও ওর এই অকপট স্বগতোক্তিতে খিলখিলিয়ে হেসে উঠল।

কথায় কথায় লোলা জানাল যে গোয়া তার অত্যন্ত প্রিয়। এই নিয়ে সে গোয়াতে পঞ্চমবার বেড়াতে এসেছে এবং প্রতিবারই এই কার্নিভালের সময়টাই সে বেছে নেয়। প্রথমত, বছরের শেষে ক'টা প্রিভিলেজ লিভ বাঁচল, সেই বুঝে ছুটিটা বাড়ানো বা কমানো যায়। দ্বিতীয়ত, এইসময় লিভ ট্রাভেল কনশেসনটা পাওয়া যায়, যাতে করে ওর বম্বে থেকে গোয়ায় আসা-যাওয়ার প্লেন ভাড়াটা উঠে যায়। বম্বে থেকে গোয়া আসার রাতভর বাস জার্নিটা বড্ড ক্লান্তিকর। তৃতীয়ত, গোয়া বেড়ানোর পক্ষে এটাই সবচাইতে ভালো সময়। আর সব থেকে বড়ো কারণ হল এ সময় তার অফিসের কাজের চাপ সাধারণত কম থাকে।

লোলা আরও জানাল যে যদিও স্নান করতে সে রোজ সকালে কালাঙ্গুট বিচেই আসে, কিন্তু নিরিবিলিতে থাকার জন্য কালাঙ্গুট আদর্শ জায়গা নয়। এখানে লোকজনের ভিড়, দোকানপাট এতে বেশি যে বম্বের থেকে কোনোভাবে আলাদা মনে হয় না। সে প্রতিবছর আঞ্জুনা বিচের একটা পরিচিত প্রাইভেট গেস্ট হাউসে থাকে। এবারও তাই করেছে। কথায় কথায় সে আরও জানাল যে গোয়ার ছায়া সুনিবিড়, শান্ত শহরতলিগুলিতে ঘুরে বেড়াতে, চিল্ড সোডা দিয়ে ফেনি খেতে আর বিভিন্ন ভাষাভাষীর লোকজনের সাথে মিশতে ও আড্ডা মারতে সে ভালোবাসে। প্রতিবারই বোম্বাই ফিরে যাওয়ার সময় বেশ কিছু নতুন দেশি-বিদেশি বন্ধু তার জুটে যায়, যাদের অনেকের সাথে তার এখনও পত্রালাপ চলে। মৈনাক গভীর মনোযোগ দিয়ে এতক্ষণ ওর কথা শুনছিল। বিয়ারের শেষ চুমুকটুকু দিয়ে ও বলল, 'আপনি কিন্তু আপনার সম্বন্ধে এখনও বিশেষ কিছুই আমাকে বলেননি...।' লোলা এবার রহস্যঘন হেসে বলল, 'যেমন?' তারপর মৈনাককে অপ্রস্তুত করেছে দেখে হাসল এবং আরাম কেদারা ছেড়ে উঠে পড়তে পড়তে বলল, 'কাম লেটস গো ফর এ সুইম ... ইউ আস্কড, ফর ইট দেন...' বলেই তড়াক করে উঠে দাঁড়িয়ে বালির ওপর দিয়ে সমুদ্রের দিকে দৌড়োতে শুরু করল। মৈনাক ওর পিছু নিল, কিন্তু ওকে অতিক্রম করার কোনো চেষ্টাই করল না, লোলাকে অথবা লোলার শরীরটাকে আরও ভালো করে দেখার জন্য।

লোলা আকর্ষণীয়, এ বিষয়ে কোনো সন্দেহ নেই। গড় ভারতীয় নারীর তুলনায়

সে লম্বা। মৈনাকের আন্দাজ বলছিল তা অন্তত পাঁচ ফুট সাড়ে ছ'ইঞ্চি হবে। মাথায় ঘন কালো কোঁকড়া চুল, অনেকটা ক্যারিবিয়ানদের মতো। বুক, কোমর ও নিতম্ব প্রায় ভাস্কর্যের ফরমাশে গড়া। এতটুকু বাহুল্য নেই। সবচাইতে আকর্ষণীয় ওর পা দুটো। সুঠাম মেদবর্জিত, বাদামি রঙের উরুদ্বয় ছন্দের মতো গুরু নিতম্ব থেকে নেমে এসেছে হাঁটুতে। লোলা শুধু যে শরীরচর্চা সম্বন্ধে সচেতন তাই নয়, সম্ভবত অ্যাথলিট। ওর সাবলীল দৌড়োনো দেখে অন্তত মৈনাকের তাই-ই মনে হল। ওর স্টেপিং, এলবোর ব্যাক পুশ আর ফরোয়ার্ড থ্রাস্ট দেখে মৈনাক নিশ্চিত হল যে লোলা হয় অ্যাথলিট ছিল অথবা এখনও আছে। লোলা একবার ছুটতে ছুটতে পেছনে ঘাড় ঘুরিয়ে মৈনাককে হাতের ইশারা করে ডাকল, 'হেই, কাম অন।' মৈনাক হাসতে হাসতে তাকে হাত নেড়ে আশ্বস্ত করল।

সমুদ্রে নেমেই মৈনাকের মনে হল লোলার সঙ্গে একবার সাঁতারের লড়াইয়ে নেমেই দেখা যাক না। যদিও লোলার সাঁতার কাটার দক্ষতা বলে দিচ্ছে যে ও একজন চোস্ত সাঁতারু, তবুও সমুদ্রে মৈনাক এক অন্য মানুষ। লোলা প্রথমে মৈনাককে পেছনে ফেলে অনেকটা এগিয়ে গেল, কিন্তু যেই ঢেউয়ের ধাক্কা শুরু হল লোলার গতি ক্রমশ হ্রাস পেল। মৈনাক সেখানে অদ্ভুত দক্ষতায় ঢেউগুলোর নীচে ডুব দিয়ে দিয়ে অনেক এগিয়ে গেল। লোলা শেষপর্যন্ত হাল ছেড় দিল। ভাসমান অবস্থায় হাঁফাতে হাঁফাতে চেঁচিয়ে বলল, "Mac Okay you win. Now come lets go back." মৈনাক বক্র হেসে পাড়ের দিকে ঘুরে সাঁতার কাটতে শুরু করল।

বিচে এসে লোলা জানাল যে এখনকার মতো এখানেই শেষ। রোদের তেজ বাড়ছে, এবার সে গেস্ট হাউসে ফিরে যাবে। মৈনাক শুধু জানাল যে সে বিকেলে এইখানেই থাকবে, লোলার জন্য অপেক্ষা করবে। লোলা ওর বাইকে ঝড় তুলে চলে গেল। মৈনাক লজে ফিরে স্নান করল, খেলো, তারপর গভীর দিবানিদ্রায় মগ্ন হল।

মৈনাকের দিবানিদ্রা যখন শেষ হল তখন রক্তিম আরব সাগরে সূর্য অস্ত যাচ্ছে। গাঙচিলগুলো অকুণ্ঠ উত্তেজনা নিয়ে চতুর্দিকে উড়ে বেড়াচ্ছে। আঞ্জুনা বিচের পেছনের টিলাগুলো অজস্র চুমকির উড়নি গায়ে আরও একটা স্বপ্নের রাত জাগতে চলেছে। বহুদূরে, প্রায় দক্ষিণ দিগন্তে আগুয়াড়া ফোর্টের লাইটহাউসের ঘূর্ণীয়মান সার্চ লাইটটা যেন এ রাতের একলা প্রহরী। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মৈনাকের ছোটোবেলায় পড়া একটা কবিতা মনে পড়ে গেল।

I must go down to the seas again
To the rolling sea and the tide

To the gulls way and the whales way
Where the wind is like a whetted knife ...

John Masfield-এর এই কবিতাটা মৈনাকের খুব ভালো লাগত। পড়তে পড়তে একটা মাতাল সমুদ্র আর একটা পাগল নাবিকের ছবি তার চোখের সামনে ভেসে উঠত। অনন্ত জলরাশি, শূন্য নীল আকাশ, জনশূন্য বাতাসের প্রতিটি অণু থেকে যেন ধরিত্রীর ঔদার্য চুঁইয়ে চুঁইয়ে পড়ছে। বহুবার, বহু বহুবার মৈনাক নিজেই নিজের কাছে জানতে চেয়েছে কেন এই ছবিটা তার চোখের সামনে ভেসে ওঠে, কেনই বা এই কবিতাটা তার এত, এত ভালো লাগে। নাবিক, কেতা করে বললে মেরিন ইঞ্জিনিয়ার, সে কখনও হতে চায়নি, হবার চেষ্টাও করেনি। তবু কেন? তবে কি মারা যাওয়ার আগে তাকে লেখা শেষ চিঠিতে বাবা যা বলেছিলেন তাই সত্যি? 'জানিস মনু, পৃথিবীর সব মানুষই বোধহয় একজন বন্দর ছেড়ে আসা নাবিক। সে কালের গতির বিপরীতে শূন্যতাকে খুঁজে বেড়ায় ও খুঁজে বেড়ায় অনন্ত একাকিত্ব আর অপরিমেয় ঔদার্য। কিন্তু এসবই হল ভাষার রসনা, একটা নৈর্ব্যক্তিক চেতনা বিলাস। মানুষ আসলে এসকেপিস্ট। সে চায় পালিয়ে বেড়াতে, দায়িত্ব এড়াতে। আর যতই সে দায়িত্ব এড়াতে চায়, দায় ততই তার ঘাড়ে চেপে বসে। তাই নিদ্রায়, জাগরণে, সে শুধু হতে চায় এক বন্দর ছেড়ে আসা নাবিক।' মৈনাক বহুক্ষণ শূন্য দৃষ্টিতে আকাশের অসংখ্য তারাগুলোর মিটমিটে চাহনির দিকে তাকিয়ে রইল। কানে খুব হালকা সুরে খালি গলায় গাওয়া গানের একটা সুর আসছে। গানের কথাগুলো দুর্বোধ্য। সুরটাও কেমন অদ্ভুত। মৈনাক আস্তে আস্তে ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল পেছনের ছাউনিটায় অল্প আলোতে দুটো পূর্ব এশীয় ছেলে গিটার বাজিয়ে নিজেদের মনে গান গাইছে। মৈনাক দু-পা হেঁটে গিয়ে গোটা চারেক চেয়ার ছেড়ে এক পাশের একটা চেয়ারে বসল। টেবিলটা খালি ছিল। মৈনাক এসে বসতেই একটা ছেলে এগিয়ে এল অর্ডার নেওয়ার জন্যে। মৈনাক ইশারায় তাকে ডবল পেগ হইস্কি দিতে বলল। এক ঢোকে সেটা গলা দিয়ে নামিয়ে দিতেই যখন গলাটা জ্বলে উঠল, মৈনাক ঘড়িতে দেখল আটটা বেজে গেছে। লোলার আসার আর কোনো সম্ভাবনা নেই। মৈনাক আবারও ইশারায় ডবল পেগের অর্ডার দিয়ে পা দুটো ছড়িয়ে দিয়ে ঘাড় আর মাথাটা চেয়ারের কাঁধে এলিয়ে দিল। পূর্ব এশীয় ছেলেদুটো গানটা এখনও গেয়ে যাচ্ছে। সুরটা কেমন ঘুমপাড়ানি ধরনের। মৈনাক আবার গলা দিয়ে দু-পেগের হুইস্কি এক ঝটকায় নামিয়ে দিল। গলা আর বুকটা আবার জ্বলে উঠতেই মৈনাক হঠাৎ চেঁচিয়ে উঠে ধমকের সুরে বলল 'Fuck you'। পূর্ব এশীয় ছেলেদুটো প্রথমে হকচকিয়ে গান থামিয়ে দিল। তারপর

হয় মাতাল নয় পাগল ভেবে হি হি করে হেসে উঠল। মৈনাকের আর সেসব খেয়াল করার উপায় নেই। তার নেশা এখন সপ্তমে চড়ে গেছে। টলতে টলতে সে বিল মিটিয়ে ভেজা বালির ওপর হাঁটতে শুরু করল। এক সময় জড়িয়ে আসা পায়ে হোঁচট খেয়ে বালিতে পড়ে গেল। হাত-পাগুলো ছড়িয়ে দিতে দিতে ওর কেবল মনে হল এমন নরম গদির বিছানায় তার অনেকদিন শোওয়া হয়নি। তারপর অনেক তন্দ্রা ডিঙিয়ে ঘুম ভাঙল পরদিন পাখির ডাকে।

ঘুম ভেঙেই লোলার মুখটা দেখে মৈনাকের প্রথমে মনে হল সে বোধহয় কোনো স্বপ্ন দেখছে। একটু পরে লোলার হাসতে হাসতে ওকে ঠেলা দেওয়াতে মৈনাকের বিভ্রম কাটল। লোলা দম ফাটা হাসি হাসতে হাসতে বলল, 'ও গড্ আই ক্যান্ট... আই ক্যান্ট বিলিভ... ইউ... ইউ ড্র্যাঙ্ক সো মাচ... ইউ ড্র্যাঙ্ক সো মাচ... নাউ কাম ওন... গেট আপ অ্যান্ড মেক ইয়োরসেলফ লুক সিভিলাইজড।' মৈনাক একটু বিব্রত হয়ে উঠে পড়ল। তারপর ওর হোটেলের দিকে হেঁটে যেতে যেতে লোলার দিকে ঘাড় ঘুরিয়ে বলল, 'I will be back in an hour' লোলার তখনও হাসি থামেনি।

ঘণ্টাখানেক পরে মৈনাক ফিরে এসে দেখল লোলা সমুদ্রে নেমে গেছে। মৈনাক কিছুক্ষণ বালির ওপর বসে রইল। আজ যেন জলে নামতে ইচ্ছে করছে না। কেমন একটা আলস্য সারা শরীরে ছড়িয়ে আছে। গত রাত্রের নেশাটা এখনও তার মস্তিষ্ককে শিথিল করে রেখেছে। কিছুক্ষণের মধ্যেই লোলা ওকে লক্ষ করে জল থেকে উঠে এসে ডাকাডাকি শুরু করল। তাতেও মৈনাক সাড়া না দেওয়ায় লোলা কাছে এসে ওর একটা হাত ধরে হ্যাঁচকা টান দিল। পরিত্রাণ নেই দেখে মৈনাক আলস্য ভরা পায়ে উঠে দাঁড়াল।

জলে নামতেই মৈনাকের শরীরের প্রতিটি কোশ যেন আবার সতেজ হয়ে উঠল। সে আস্তে আস্তে হাত-পাগুলো ছড়াতে শুরু করল। সামনে তাকিয়ে দেখল লোলা বাটারফ্লাই স্ট্রোকে অনেকটা এগিয়ে গেছে। ওর পেলব নাভি, জঙ্ঘা আর বুক একটা ভেলার মতো ভেসে যাচ্ছে। লোলা একটা লাল রঙের টু পিস বিকিনি পরেছে। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মৈনাকের শরীরের ভেতর কেমন একটা চেনা-অচেনা চাঞ্চল্য আঁকিবুকি কাটতে শুরু করল। সে জলের মধ্যেই কয়েকবার শিউরে উঠে গা ঝাড়া দিল। তারপর একসময় ডলফিনের মতো ঝটিতি জলের তলায় তলিয়ে গেল। চাঞ্চল্যটা খুব দ্রুত বেড়ে চলেছে। হাত-পা জুড়ে একটা বাসনার লহরী যেন তার ক্ষীণতম মূর্ছনা থেকে আরও দৃঢ়, আরও বলিষ্ঠ আরও নির্মম হয়ে উঠছে। মৈনাক প্রায় নিঃশব্দে লোলার অলক্ষ্যে ওর শরীরের নীচে পৌঁছে গেল। তারপর লোলা কিছু

বুঝে ওঠার আগেই শক্ত হাতে ওর পায়ের গোড়ালি দুটো ধরে জলের নীচে ওকে টেনে নামিয়ে আনল। এই আচমকা আক্রমণে লোলা আঁতকে উঠতে যাচ্ছিল, কিন্তু মুহূর্তের মধ্যে তার মুখ জলের তলায় চলে যাওয়ায় সে শব্দ চাপা পড়ে গেল। জলের নীচের আলো-আঁধারের মধ্যে সে আবছাভাবে মৈনাককে চিনতে পারল। মৈনাক অবশ্য ততক্ষণে নিজের দুই ঠোঁট লোলার ঠোঁটে জুড়ে দিয়ে ব্যস্ত দুহাতে লোলার শরীরে কী খুঁজে বেড়াতে শুরু করেছে। দম আটকে আসার ঠিক আগের মুহূর্তে লোলা প্রাণপণে মৈনাকের শরীরে একটা প্রবল ধাক্কা দিয়ে নিজেকে ছাড়িয়ে নিয়ে জলের ওপর ভেসে উঠল। তারপর এক মুহূর্ত অপেক্ষা না করে অস্বাভাবিক ক্ষিপ্রতায় পাড়ের দিকে সাঁতরাতে শুরু করল। মৈনাক যতক্ষণে পাড়ে পৌঁছাল, লোলা ততক্ষণে অদৃশ্য হয়েছে। মৈনাক বহুক্ষণ ভিজে গায়ে বালির ওপর গুম মেরে বসে রইল। সারা শরীরে একটা অদ্ভুত ক্ষোভ আর নিষ্ঠুর উত্তেজনা। তার স্পর্শকাতর জায়গাগুলো ভীষণ দাপাদাপি করতে থাকল কিছুক্ষণ। তারপর শিরায়-উপশিরায় রক্ত চলাচলটা যখন আস্তে আস্তে শান্ত হয়ে এল, সে ধীর পায়ে হোটেলের দিকে হাঁটতে শুরু করল।

হোটেলে ফিরে মৈনাক সজোরে দরজাটা বন্ধ করল। তারপর বেলা গড়িয়ে দুপুর, দুপুর গড়িয়ে বিকেল, বিকেল গড়িয়ে সন্ধ্যা, সন্ধ্যা ফুরিয়ে রাত হল, কিন্তু মৈনাক ঘরের দরজা খুলল না। বন্ধ ঘরে সে শুধু একটা অশান্ত, ক্রুদ্ধ জন্তুর মতো পায়চারি করতে থাকল। তারপর ভোরের আলো ফুটতেই সে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এসে উদ্দেশ্যহীনভাবে হাঁটতে থাকল। গোয়ার সন্ধেটা বড়ো। রাত বারোটা না বাজলে তা ফুরোতেই চায় না। তেমনি গোয়ার সকাল শুরু হয় অনেক দেরিতে। নিদেনপক্ষে আটটায়। এই সকাল সাড়ে পাঁচটায় তাই রাস্তাঘাট ফাঁকা। একটা পাগলা ভিখিরি আপনমনে রাস্তা থেকে সিগারেটের খালি প্যাকেট কুড়োচ্ছিল। মৈনাককে দেখে দাঁড়িয়ে পড়ে সামরিক আড্ডার প্রচলিত প্রথায় স্যালুট করল। মৈনাক খুশি হয়ে প্রতি অভিবাদন জানাল। রাস্তার বাঁকে একটা ভ্রাম্যমাণ টি-স্টলে চা-ওয়ালা কেটলিতে চায়ের জল চাপিয়েছে। তাকে ঘিরে কিছু চা-পিপাসুর ভিড়। দূরে একটা রাস্তার কলে দুজন প্রাইভেট ট্যাক্সিওয়ালা গাড়ি ধুচ্ছে। ভোরের ফুরফুরে বাতাসে মৈনাকের মানসিক অবসাদটা কেটে গিয়ে শরীরটা হালকা করে দিতে থাকল।

মৈনাকের খেয়ালই নেই কখন কালাঙ্গুট বিচ শেষ হয়ে বাগা বিচ শুরু হয়ে গেছে। রাস্তার দু'ধারটা এখানে বেশ ফাঁকা ফাঁকা। বাড়ি-ঘর অপেক্ষাকৃত কম। সমুদ্রটা সরাসরি দেখা যাচ্ছে। একটু এগিয়েই দু'রাস্তার একটা মোড় পড়ল। পথের পাশের ফলকে একটা রোডম্যাপ। লেখা আছে, 'আঞ্জুনা যাবার পথ', মৈনাক সেদিকেই

হাঁটতে থাকল। সামনে একটা ছোটো সেতু, কালভার্টও বলা চলে। তার নীচ দিয়ে একটা নদী তিরতির করে বয়ে গিয়ে সমুদ্রে মিশেছে। নদীটার ঠিক ওপারে গুটিকয়েক ছোটো ছোটো টিলা, যার গা বেয়ে রাস্তাটা নারকেল গাছের ছায়ায় মিলিয়ে গেছে। মৈনাক সেতুর মাঝখানে এসে দাঁড়িয়ে পড়ল। রেলিং-এ হাত রেখে পুব দিকে তাকাল। আঁকাবাঁকা নদীর উৎসটা টিলাগুলোর ঘন গাছপালায় হারিয়ে গেছে। তবে যেখান থেকেই উৎস হয়ে থাকুক, জলটা একদম কাচের মতো স্বচ্ছ। নীচের নুড়িগুলো গোনা যাচ্ছে স্বচ্ছন্দে। অজস্র নাম না-জানা মাছ পরম শান্তিতে খেলছে। মৈনাক তন্ময় হয়ে ওদের খেলা দেখতে থাকল। নদীর দু'ধারের নারকেল গাছের সবুজ ছায়াগুলো জলের ওপর খুব অল্প, প্রায় নিঃশব্দে কাঁপছে।

মৈনাকের বাঁ কাঁধে একটা আলতো হাতের ছোঁয়া লাগতেই ও ঘুরে তাকিয়ে দেখল লোলা হাসি হাসি মুখে দাঁড়িয়ে আছে। মৈনাক সৌজন্যবশত না হেসেই বলল, 'হ্যালো!' লোলা তেমনই হাসিমুখে বলল, 'হাই। এত সকালে এখানে কী করছ?' মৈনাক সে প্রশ্নের উত্তর না দিয়ে না জানার ভঙ্গি করে কাঁধ ঝাঁকাল। লোলা আবার বলল, 'আমি তোমায় অনেক দূর থেকেই লক্ষ করেছি। কিন্তু কী করে কথা শুরু করব বুঝে পাচ্ছিলাম না। মৈনাক চুপ করে শুনল, কিন্তু কোনো উত্তর না দিয়ে জলের দিকে তাকিয়ে রইল। লোলা কিছুক্ষণ চুপ থেকে খুব আলতো করে মৈনাকের হাতটা ছুঁয়ে অনুতপ্ত গলায় বলল, 'ম্যাক আই অ্যাম সরি ...' মৈনাক বুঝল লোলা কী বিষয়ে কথা বলতে যাচ্ছে, কিন্তু তবুও পাকা অভিনেতার মতো গলায় অবাক বিস্ময় এনে বলল, 'সরি ফর হোয়াট?' লোলা আরও কুণ্ঠিত স্বরে বলল, 'ফর দ্য ওয়ে আই বিহেভড, ইয়েস্টারডে ... বাট ম্যাক ..... বিলিভ মি, আই হ্যাভ নেভার ডান ইট বিলো দ্য ওয়াটার। আই ফেল্ট ভেরি সাফোকেটেড' মৈনাক হঠাৎ হো হো করে হেসে উঠে বলল, 'ফরগেট ইট।' লোলা প্রথমে একটু দ্বিধাগ্রস্তভাবে, পরে সাবলীলভাবে ওর হাসিতে যোগ দিল। তারপর হাসি থামিয়ে বলল, 'আমি পেরিনিম আর টিরাকোল বিচ যাচ্ছি। তুমি ইচ্ছে করলে আমার সঙ্গে যেতে পার ...।' মৈনাক কয়েক মুহূর্ত কী ভাবল তারপর বলল, 'যাব, কিন্তু একটা শর্তে। বাইক আমি চালাব, তুমি পেছনে বসবে। ঠিক আছে?' লোলা অসম্মতি জানিয়ে হেসে মাথা ঝাঁকাল। মৈনাক আর দ্বিরুক্তি করল না।

লোলা আজ একটা শ্যাওলা রঙের টি-শার্ট আর নীল জিনসের ট্রাউজার পরেছে। পায়ে একটা স্পোর্টস শু, মাথায় একটা গলফ ক্যাপ, চোখে সানগ্লাস আর চুলগুলো পনিটেল করে বাঁধা। ওকে দেখে চট করে ছেলে কী মেয়ে বোঝা যাবে না। এমনকি

যে কেউ ওকে ছেলে পপস্টার বলেও ভুল করতে পারে। লোলা বাইকে স্টার্ট দিয়ে ঝড়ের মতো এগিয়ে চলল। গোয়ার সমুদ্র পার্শ্বস্থ জায়গাগুলোর মাটি যতটা সরস, পূর্বদিকগুলো ততটাই রুক্ষ। তবুও সর্বত্রই সবুজের সমারোহ।

টিরাকোল আর পেরিনিম বিচ দুটো লাগোয়া আর ভীষণ নির্জন। সামনে দুটো ছোটো ছোটো টিলা, যার মাথার ওপর একটা প্রাচীন পর্তুগিজ দূর্গকে হোটেলে পরিণত করা হয়েছে। ওরা যখন হোটেলে চেক্ ইন করল তখন বেলা এগারোটা। ওরা যখন স্নানে নামল টিরাকোল বিচ তখন ফাঁকা। চারদিকে অজস্র গাছপালা, দিগন্ত বিস্তৃত সমুদ্র থাকা সত্ত্বেও রোদের তেজটা অস্বস্তিকর। মৈনাক অনিচ্ছা সত্ত্বেও লোলার অনুরোধ রাখতে কিছুক্ষণ জল ঘাঁটাঘাঁটি করেই উঠে এসে ঘন নারকেল গাছের ছায়ার নীচে বসল। চারদিকে অদ্ভুত একটা নির্জনতা। দূরে নদীর ওপর ঝুঁকে পড়া ঘন সবুজ গাছ, মোহনার কাছের নারকেল বাগান, বহু দূরের গ্রাম, জনবসতি, সামনের ধবধবে সাদা চার্চটা সবই যেন একটা গল্পের ধারাবাহিকতা নিয়ে বয়ে চলেছে, অথচ কোনো শব্দ নেই। এমনকি বহু ওপরে সূর্যটাও নিঃশব্দে নিজের আগুনে নিজে পুড়ছে। মৈনাকের হঠাৎ মনে হল আজকের দিনটা ভারী অদ্ভুত তো! আজ কোথাও যাওয়ার তাড়া নেই। আজ কোনো দুর্ভাবনা নেই। কাউকে জবাবদিহি করার ব্যাপার নেই, কাউকে জোর করে খুশি করার ব্যাপার নেই। কিছু শুরু করার নেই, কিছু শেষও করার নেই। কিছু চাওয়ার নেই, কিছু পাওয়ারও নেই। আজ শুধু এক শ্বাসরোধকারী নিঃশব্দ দহনে জ্বলে পুড়ে খাক হয়ে যাওয়া।

হঠাৎ বাঁ কানে একটা শীতল স্পর্শে মৈনাকের চিন্তায় ছেদ পড়ল। ঘাড় ঘুরিয়ে দেখে বুঝল লোলা নিঃশব্দে জল থেকে উঠে ওর পেছনে এসে নিজের ভেজা ঠোঁট দিয়ে ওর কানের লতিতে ভীষণ কামুক একটা স্পর্শ করেছে। মৈনাক কিছুক্ষণ লোলার ভেজা ঠোঁট আর চোখ দুটোর দিকে তাকাল তারপর মুখ ঘুরিয়ে নিয়ে দূরের নদীটার দিকে তাকাল অনেকটা যেন লোলাকে উপেক্ষা করে। লোলা যথেষ্ট অপ্রতিভ একটা হাসি হেসে অনেকটা স্বগতোক্তির মতো মৈনাককে উদ্দেশ করে বলল, 'You know, you are very touchy ... almost a kid.' তারপর হাত বাড়িয়ে জোর করে মৈনাকের মুখটা নদীর দিক থেকে নিজের দিকে ঘুরিয়ে খুব কামঘন স্বরে বলল, 'Mac, give me a kiss.' মৈনাক খুব ধীরে ধীরে মুখ ঘুরিয়ে লোলার চোখে চোখ রাখল। সে দৃষ্টিতে আবেগের উত্তাপের পরিবর্তে ছিল নিদারুণ শৈত্য। লোলা অধৈর্য হয়ে বলল, 'Mac ... come on ...' মৈনাক খুব আস্তে আস্তে তার ঠোঁট লোলার অল্প হাঁ করা ঠোঁট দুটোয় ছোঁয়াল। তারপর খুব সন্তর্পণে জিভটা প্রসারিত করে

লোলার ঠোঁটের মধ্যে দিয়ে মুখে প্রবেশ করাল। সঙ্গে সঙ্গে লোলার হাত দুটো প্রবল আবেগে শক্ত হয়ে মৈনাকের পিঠটাকে আঁকড়ে ধরল। অল্পক্ষণের মধ্যেই লোলার শরীরে অসম্ভব কাঁপুনি শুরু হল, মৈনাক কিন্তু শান্ত। শান্ত হাতে সে লোলার বক্ষবন্ধনীটা খুলে ফেলে ওর ভেজা স্তনে মুখ ডোবাল। লোলার উত্তপ্ত শ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে একটা গাঢ় উমম্ শব্দ বেরোতেই মৈনাক ওর ঠোঁট আর জিভটা খোল ছেড়ে বেরিয়ে আসা শামুকের মতো নিপুণভাবে লোলার শরীরের দক্ষিণ প্রান্তে নামিয়ে নিয়ে চলল। মৈনাক যখন লোলার উন্মুক্ত ঊরুসন্ধিতে মুখ ডোবাল লোলা তখন এক অস্বাভাবিক চরম মুহূর্তের দিকে ঝড়ের মতো এগিয়ে চলেছে। ঊরু দুটি প্রসারিত করে সে শুধু উন্মাদের মতো মৈনাকের শরীরটা নিজের কাছে টেনে আনতে চাইল।

অনেক সময় নিয়ে মৈনাক মাথা তুলল তারপর তার শীতল, বলিষ্ঠ দশটা আঙুল ভেসে চলল লোলার নিতম্ব থেকে কোমরে, পিঠের ভাঁজে, তারপর কাঁধ ছুঁয়ে গলায় এসে থামল। যৌন সুখের শিখর থেকে নেমে লোলা যতক্ষণে আন্দাজ করতে পারল কী হতে চলেছে ততক্ষণে মৈনাকের দশটা আঙুল লোলার শ্বাসনালীর ওপর শক্ত হয়ে বসে গেছে। বাঁচার শেষ চেষ্টা শুরু করার আগেই তার হাত-পা শিথিল হয়ে একসময় নিথর হয়ে গেল। শুধু অবাক বিস্ময় আর আতঙ্ক নিয়ে তার চোখ দুটো সবুজ পাতার আচ্ছাদনের মধ্যে দিয়ে নীল আকাশের দিকে চেয়ে রইল। সেদিকে তাকিয়ে থাকতে থাকতে মৈনাক অনুভব করলে যে তার এতক্ষণের শীতল শরীরে উত্তাপ সৃষ্টি হচ্ছে, শরীরের প্রতিটি কোশে এতক্ষণের সুপ্তথিত শলাগুলো লক্ষ লক্ষ আগুনের শিখায় রূপান্তরিত হচ্ছে। সে ব্যস্ত হাতে লোলার ঊরু দুটোকে আরও প্রসারিত করে দিল। তারপর নিজেকে রিক্ত করে সে যখন উঠে দাঁড়াল তখন লোলার মৃতদেহে র‍্যিগার মরটিস শুরু হয়ে গেছে।

লোলার নগ্ন মৃতদেহটায় দু-টুকরো সুইম-সুইটটা পরিচ্ছন্নভাবে পরিয়ে দিয়ে শরীরটাকে আধ-শোওয়া করে গাছের গুঁড়িতে হেলান দিয়ে রাখতে মৈনাকের মিনিট পাঁচেক লাগল। তারপর খুব শান্ত পায়ে হোটেলে ফিরে সে স্নান করল, জামাকাপড় পরল এবং লোলার জামা-প্যান্ট কাঁধে ও জুতো জোড়া হাতে নিয়ে সে লোলার সানগ্লাসটা নিজের চোখে আঁটল । তারপর হোটেলের বিল পুরো মিটিয়ে বাইকের চাবিটা হাতে নিয়ে হোটেল ছেড়ে বেরিয়ে এল। দূর থেকে একবার দেখে নিল টিরাকোল বিচ এখনও জনশূন্য। পথের ধারে গাছে ছায়ায় সে বাইকটা রেখে লোলার মৃতদেহের কাছে গেল। লোলা তেমনিভাবেই আধ-শোওয়া হয়ে রয়েছে, মৈনাক কাঁধ থেকে লোলার জামা, প্যান্ট ও জুতো জোড়া লোলার মৃতদেহের পাশে যত্ন নিয়ে সাজিয়ে

রাখল, তারপর বাইকে চেপে বসে স্টার্ট দিল।

মৈনাক যখন কালাঙ্গুট ফিরে আসল তখন দুপুর তিনটে। একটা গমগমে ভিড়ের পার্কিং লটে সে বাইকটা স্ট্যান্ডের উপর দাঁড় করাল। তারপর নিজের হোটেলে এসে খুব শান্ত হাতে সুটকেস গোছাতে শুরু করল। ঢাউস সুটকেসটার এক কোনায় একটা ছোটো শেভিং পাউচ্। মৈনাক নিজের গালে হালকাভাবে হাত বোলাল। তিন দিনের না-কাটা দাড়ি, খোঁচা খোঁচা হয়ে রয়েছে। মৈনাক সেফটি রেজারটা বের করে একবার গালের ওপর টেনে দিল। এবার গালটা ঝকঝকে পরিষ্কার হয়ে গেল। শেভিং পাউচটার ভেতরে হাতড়াতেই এক টুকরো কাগজের খাম বেরিয়ে এল। খামটা খুলতেই মৈনাকের চোখে-মুখে একটা হাসির ঝিলিক খেলে গেল। একটা ফলস্ ফ্রেঞ্চকাট দাড়ি। মৈনাক সযত্নে খামটা নিজের বুকপকেটে রেখে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ছাড়ল। তারপর শেভিং পাউচে রেজারটা রেখে দ্বিতীয়বার হাতড়াতেই মৈনাক ঠিক যেটা চাইছিল তা পেয়ে গেল ... একটা লিকুইড হেয়ার ডাই। নিজের মনেই অল্প হেসে মৈনাক সেটাকে প্যান্টের পকেটে রাখল। তারপর বেয়ারাকে দিয়ে হোটেলের বিল মিটিয়ে শান্ত পায়ে সিঁড়ি দিয়ে নীচে নেমে এল। বেয়ারাটা হাসি মুখে এগিয়ে এল ওর সুটকেসটা বয়ে নিয়ে যাবার জন্য। মৈনাক ওর পকেটে দশটা টাকা গুঁজে দিয়ে হাতের ইশারায় চলে যেতে বলল। খুব অন্যমনস্কভাবে অথচ তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে সে চারদিকে একবার চোখ বুলিয়ে নিল। মিস্টার কেটার্স-এ লোকের ভিড় উপচে পড়ছে। হোটেল কর্মীরা ত্রস্ত পায়ে ভিজিটর সার্ভ করতেই ব্যস্ত। মৈনাক শান্ত পায়ে আউটডোর টয়লেটটায় ঢুকে গেল। লিকুইড হেয়ারডাইটা ব্রাশ দিয়ে যত্ন নিয়ে সে সারা মাথায় লাগাল। তারপর মনোযোগ দিয়ে আয়নায় দেখল কোনো একটা চুল বাদ গেছে কিনা। আশ্বস্ত হয়ে সে পকেট থেকে ছোটো চিরুনিটা বের করে চুল আঁচড়াল। তারপর পকেট থেকে খামটা বের করে নকল দাড়িটা থুতনিতে সেঁটে দিল। চেহারাটা যেন আমূল বদলে গেল। মৈনাক ঠোঁটের কোণ দিয়ে হাসল। রোদটা সবে পড়তে শুরু করেছে। ঘড়িতে চারটে দশ। মৈনাক প্যান্টের ডান পকেট থেকে লোলার সানগ্লাসটা বের করে চোখে এঁটে নিয়ে টয়লেট থেকে বেরিয়ে এল। তারপর সুটকেসটা হাতে নিয়ে ট্যাক্সিস্ট্যান্ডের দিকে শান্ত পায়ে হাঁটতে শুরু করলো।

ডাবলিন এয়ারপোর্টে যেতে হবে বলাতে ট্যাক্সিওয়ালা অবাক হয়ে বলল, 'সাব আভি তো ফ্লাইটকা টাইম চলা গিয়া'। মৈনাক অল্প হেসে বলল, 'কই বাত নেহি, তুম চলো তো সহি।' 'ট্যাক্সিওয়ালা মুখ দিয়ে চুক্ করে একটা বিরক্তিজনিত শব্দ করে গাড়িতে স্টার্ট দিল। পানাজি পৌঁছে মৈনাক ট্যাক্সিওয়ালাকে জিজ্ঞাসা করল, 'এক কাম

করো, তুম সিধা বোম্বাই চল।' ট্যাক্সিওয়ালা সোজাসুজি না বলে একটা লম্বা দাম হাঁকিয়ে দিল, 'কই বাত নেহি। যো মাং রহে হো ও মিলেগা।' ট্যাক্সিওয়ালা এবার আর না বলতে পারল না। মোড় ঘুরিয়ে সে ড্যাশবোর্ডের টেপরেকর্ডারটাতে একটা চটুল হিন্দি গানের ক্যাসেট গুঁজে দিয়েই এক্সিলেটারে চাপ দিল।

মৈনাককে নিয়ে ট্যাক্সি যখন ভি টি স্টেশনে ঢুকল তখন গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস ছাড়তে আর মাত্র আধ ঘণ্টা বাকি। মৈনাক ট্যাক্সিওয়ালার ভাড়া মিটিয়ে দিয়ে নীচে নামতেই দুটো রাত জাগা রুক্ষ চেহারার ছেলে এগিয়ে এল। কাছে এসে চাপা স্বরে বলল, 'টিকিট, টিকিট, ফার্স্টক্লাস থ্রি টেয়ার'। মৈনাক একজনকে পাশে ডেকে সরিয়ে আনল। কয়েক মুহূর্ত ভাবলো ফার্স্টক্লাস নেবে না থ্রি টেয়ার। তার ষষ্ঠেন্দ্রিয় তাকে বলে দিল যে ফার্স্টক্লাসে সহজে আইডেন্টিফায়েড হওয়ার সম্ভাবনা। মৈনাক দেড়শো টাকা বেশি দিয়ে একটা থ্রি টেয়ারের বম্বে-কলকাতা টিকিট নিল। তারপর সুটকেসটা তুলে নিয়ে পেপার স্টল থেকে একটা নিউজপেপার কিনে নিজের বার্থে এসে বসল। মিনিট দশেক পরে একবার ঘড়ির দিকে তাকিয়ে দেখল ঠিক সাড়ে পাঁচটা বাজে। দু-হাতে মেলে রাখা কাগজের আড়াল থেকে মৈনাক দেখল কামরায় টিটি-র সঙ্গে দুজন পুলিশ উঠেছে। কামরার সকলের মধ্যে একটা চাপা গুঞ্জন। মৈনাক কাগজটা ভাঁজ করে কোলের ওপর ফেলে রেখে আর সবাইয়ের মতো ঔৎসুক্য নিয়ে পুলিশ দুটোকে লক্ষ করতে থাকল। পুলিশ দুটো পাঁচ-সাতজনকে জিজ্ঞাসা করতে করতে ওর সামনে এসে দাঁড়িয়েছে। মৈনাক জামার পকেট থেকে টিকিটটা বের করে হাতে রাখল। পুলিশ দুজন আর টিটি ওর পাশের লোকের টিকিটটা চেয়ে দেখল। তারপর মৈনাকের মুখের ওপর হালকা করে চোখ বুলিয়ে এগিয়ে গেল। মৈনাক টিকিটটা পকেটে রেখে দিয়ে আবার পত্রিকায় মনোনিবেশ করল। ঠিক ষোলো মিনিট লেটে গীতাঞ্জলি এক্সপ্রেস ছেড়ে দিল।

।। দুই ।।

"This interaction of the two basic instincts with and against each other gives rise to the whole variegation of the phenomena of life. The analogy of our two basic instincts extends from the region of animate things to the pair of opposing forces attraction and repulsion- which rule in the inorganic world."

প্লেনের জানালা দিয়ে কুয়াশা ভরা সকালটার দিকে একদৃষ্টিতে তাকিয়ে ছিল সঞ্জয়। ঘন কুয়াশার জন্য সকাল সাতটার কলকাতা থেকে বোম্বাইগামী বিমানটা ছাড়তে দেরি করছিল। ইতিমধ্যে নির্ধারিত সময় ছাড়িয়ে আধঘণ্টা হয়ে গেছে। প্লেনের মধ্যে সকলেই উশখুশ করতে শুরু করেছে। সঞ্জয় কিন্তু শান্ত। ওর যেন কোথাও যাবার তাড়া নেই। ওর কাছে বরং এই অপেক্ষাটাই উপভোগ্য। কোথাও যাওয়া বা কিছু করার চেয়ে কিছু করতে হবে বা কোথাও যেতে হবে এর প্রস্তুতিটাই সঞ্জয়ের বেশি ভালো লাগে। অনেকটা যেন জোর করে আশার বাতি জ্বেলে রাখার মতো। এ ছাড়াও অবশ্য আরও একটা কারণে এই মুহূর্তটা সুন্দর। সত্যি কথা বলতে কী, বহু দিন হয়ে গেল সঞ্জয়ের ভোরের কুয়াশা দেখাই হয়নি। সেই কত যুগ আগে, এক আবছা হয়ে যাওয়া কৈশোরে, তার সর্বক্ষণের সাথি ফজলের সঙ্গে, সেবতি নদীর পাড়ে, কুয়াশাভরা সকালে, খেজুরের রস পাড়তে যাওয়া। তারপর জংলা ফড়িং ধরার জন্য ধানের খেতে হুটোপুটি, শেষে রস ভরা হাঁড়ি ভেঙে ফেলে বাড়িতে ফিরে মার বকুনি খাওয়া,

সবই বড়ো আবছা, বড়ো ভাসা ভাসা, সঞ্জয় ফিকে কমলা রঙের সূর্যটার দিকে তাকিয়ে রইল। সূর্যটা প্রথমে একটু কিন্তু, কিন্তু করে তারপর টপ্ করে বেরিয়ে এসেছে। তাও এক ঘণ্টা হয়ে গেছে। অথচ কুয়াশার ভেজা ভেজা ভাবটা এখনও পুরোপুরি কাটেনি।

'গুডমর্নিং স্যার। উড ইউ লাইক টু হ্যাভ ইটস্?' সঞ্জয় ঘাড় ঘুরিয়ে দেখল আধুনিকা বিমান-সেবিকা টফির ট্রে হাতে হাসি মুখে তার সামনে ঝুঁকে দাঁড়িয়ে। কাঁচা ঘুম ভাঙা বিমান-সেবিকার একঘেয়েমি-জনিত বিরক্তি আর চড়া প্রসাধন মিলেমিশে তার হাসিটাকে আরও বাসি করে তুলেছে। সঞ্জয় বিরক্তি কাটিয়ে কোনোরকমে 'থ্যাঙ্ক ইউ' বলে মুখ ঘুরিয়ে আবার বাইরে মনোনিবেশ করল। কুয়াশাটা অনেক হালকা হয়ে এসেছে। বিশালাকার বিমানটা নড়ে চড়ে উঠল। লাইফ জ্যাকেটের গতানুগতিক ডেমনস্ট্রেশনটা শুরু হতেই সঞ্জয় সিটবেল্টটা এঁটে নিল। প্লেনের গতি দ্রুত থেকে দ্রুততর হচ্ছে। রানওয়ের দু'পাশের সবুজ ঘাসগুলো ঝড়ের মতো সরে যাচ্ছে। শরীরটা ভারী হয়ে আবার হালকা হয়ে যাওয়ার অনুভূতিটা খুব তাড়াতাড়ি ফুরিয়ে গেল। জানালার পাশের শূন্য নীল রংটার দিকে তাকিয়ে এবার সঞ্জয় চোখ বুজল।

কুয়াশা ভরা সকালটা খানিকটা অহেতুকই সঞ্জয়কে পিছিয়ে নিয়ে গেল নওগাঁও-এর সেই শৈশব আর কৈশোরে। বহুবার দেখা একটা স্বপের মধ্যে সে যেন ভেসে চলল। কানে বাজতে থাকল বাবার কথা। মাকে বলছেন, 'পোলাডা এত বেলা পর্যন্ত ঘুমায়, তুমি কিসু কইতে পারো না? তোমার আদরে আদরে ওটার আর কিস্যু হইব না! পড়াশুনার নাম নাই। খালি আকাম ...।' মা বলছেন, 'পোলাপান ঘুমায় থাকব নাকি তুমি ঘুমায় থাকবা! ঠান্ডার সময় একটু ঘুমায় আসে তো কী হইসে! পরীক্ষার সময়ও পড়, পড়। আর অখন পরীক্ষা হইয়া গেসে অখনও পড়ব।' বাবা বলছেন, 'হ। তোমার লেগে গণ্ডমূর্খ হয়ে থাকব। লোকে বলব হারান চকোত্তির পোলা আকাট মূর্খ হইসে।' মা বিরক্ত হয়ে বলছেন, 'ইঃ আকাট নয় আরও কিসু। আমার পোলায় তোমার মতন ইস্কুল মাস্টারি করব না, ও জজ্-ম্যাজিস্টর হইব।' বাবা যেন এই সম্ভাবনায় খানিকটা খুশি হয়ে হাসতে হাসতে বললেন, 'হ হ। ঘুমায় ঘুমায় ম্যাজিস্ট্রেট হইব।' বাবা আবার কিছুক্ষণ পরে গুটি গুটি পায়ে সঞ্জয়ের বিছানার কাছে ফিরে এসে কিছুটা কোমল স্বরে বলছেন, 'নতুন। উইঠ্যা পড়, তোর জন্য দুইখানি বই আনছি দ্যাখ।'

সঞ্জয় বইয়ের নাম শুনে বিছানা ছেড়ে উঠে বসেই গল্পের বইয়ের বদলে ইংরিজি গ্রামার বই দেখেই 'ধুস! গ্রামার বই!' বলেই আবার লেপমুড়ি দিয়ে শুতে গেলেই

বাবা বিরক্তি মিশিয়ে মাকে উদ্দেশ করে বলছেন, 'ওঃ গ্রামার বইয়ের নাম শুইন্যা পোলার রাগ দ্যেখসো।' তারপর খানিকটা স্বগতোক্তির মতোই বলছেন, 'হঃ অখন রাগ দেখা, আর পরীক্ষার খাতায় ভুলভাল লেইখ্যা আয়।'

'এক্সকিউজ মি স্যার? উড ইউ লাইক টু হ্যাভ ভেজ অর নন্-ভেজ?' সঞ্জয় অনিচ্ছা সত্ত্বেও চোখ খুলে সোজা হয়ে বসল। 'নন্-ভেজ' বলে সে জানালার দিকে মুখ ঘোরাল। অনেক নীচে একটা সবুজ পৃথিবী ... কত মমতা দিয়ে ঘেরা! সে মমতা নীচের খাল-বিল, নদী-নালায়, ঐ সবুজের ফাঁকে ফাঁকে আছে, শুধু মানুষের মন থেকেই মুছে গেছে। সঞ্জয়ের বহুবার মনে হয়েছে, তার বাবা-মা তাকে যে স্নেহ-মমতা দিয়ে ঘিরে রেখেছিল, এমনটি বোধহয় আর কোথাও হয় না। পরে মনে হয়েছে এ পৃথিবীতে যদি শাশ্বত বলে কিছু থেকে থাকে তা শুধু বাবা-মা'র স্নেহ-মমতা।

'এক্সকিউজ মি স্যার ... ইয়োর ব্রেকফাস্ট ... সঞ্জয় বাঁ হাতটা বাড়িয়ে ট্রে-টা নিতে নিতে বিমান-সেবিকাকে বলল, 'ক্যান আই হ্যাভ টু ডেজ স্টেটস্ম্যান প্লিজ।' বিমান-সেবিকা হেসে সম্মতি জানাল। ব্রেকফাস্টটা কোনোরকমে শেষ করে খবরের কাগজে চোখ বোলাতে বোলাতেই সান্টাক্রুজ এয়ারপোর্ট অ্যাপ্রোচ করার সাবধান বার্তা শুরু হয়ে গেল।

ঠিক ন'টা বেজে চল্লিশ মিনিটে ব্যাগেজ ক্লিয়ারেন্স থেকে নিজের ছোটো কাঁধ ব্যাগটা তুলে নিয়ে লাউঞ্জের বাইরে বেরিয়ে এসে সঞ্জয় দেখল সিআইডি (পশ্চিম) ইনস্পেকটর সত্যেন বাহুতুলে ঠোঁটের কোনায় হাসি নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সঞ্জয় হাত তুলে তাকে আশ্বস্ত করে ব্যস্ত পায়ে এগিয়ে গেল। ওরা গাড়িতে উঠে বসতেই ঝকঝকে সাদা টাটা সুমোটা অদ্ভুত দক্ষতায় এয়ারপোর্টের পার্কিং লট থেকে বেরিয়ে এসেই ষাট স্পিড তুলে নিল। সঞ্জয় জানালার কাচটা টেনে নামিয়ে দিয়েই সত্যেনকে উদ্দেশ করে বলল, 'আমাকে একটা কথা বোঝান তো মিস্টার বাহুতুলে, এই মার্ডারটাকে আপনাদের সিরিয়াল কিলিং-এর অন্তর্ভুক্ত মনে হচ্ছে কেন?' সত্যেন বাহুতুলের উত্তর প্রায় তৈরিই ছিল, সঙ্গে সঙ্গেই বললেন, 'আমাদের প্রথম লিঙ্ক ... সি রেজার্ট। আগের পাঁচটা খুনও সি রেজার্ট-এ হয়েছে।' সঞ্জয় প্রসঙ্গ প্রলম্বিত করার জন্য বলল, 'এ ছাড়া?' সত্যেন বলল, 'এ ছাড়া ভিকটিম ফিমেল ... যা আগের পাঁচটা খুনের সাথে মিলে যাচ্ছে আর সেই সঙ্গে রয়েছে ডেফিনিট প্রুফড্ সেক্সুয়াল ইন্টারকোর্স এবং সর্বোপরি মৃত্যুর কারণ গলা টিপে, শ্বাসরোধ করে ... যা আগের মার্ডারগুলোর সাথে মিলে যাচ্ছে।' সঞ্জয় অনুভব করল যে সত্যেন বাহুতুলের ডিডাকটিভ্ অ্যানালিসিস প্রায় নির্ভুল। সে চিন্তান্বিত চোখে ঘাড় ঘুরিয়ে সত্যেনকে জিজ্ঞাসা করল, 'ডেডবডি?'

সত্যেন বলল, 'পোস্টমর্টেম্ হয়ে গেছে, সুতরাং বডি মর্গে ফেরত চলে গেছে। অবশ্য আপনি দেখতে চাইলে আমরা সরাসরি মর্গে যেতেও পারি।' সঞ্জয় ওকে হাত তুলে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'পোস্টমর্টেম রিপোর্ট এসে গেছে কি? তাহলে আর ডেডবডি দেখার দরকার নেই।' সত্যেন বলল, 'হ্যাঁ তা অবশ্য কালই এসে গেছে। এ ছাড়া ডেডবডির হোয়্যারঅ্যাবাউটস্-ও ট্রেস করা গেছে। বম্বেতেই থাকত। আশা করা যায় এতক্ষণে রিলেটিভরা এসে পড়েছে।' ওরা কথা বলতে বলতেই গাড়ি নরিম্যান পয়েন্টের অফিসের সামনে এসে থামল।

ডিআইজি (সিআইডি) বসন্ত শিরোদকর চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সঞ্জয়কে অভিবাদন জানালেন। তারপর গম্ভীর মুখে বললেন, 'মিঃ চক্রবর্তী, ডেডবডি আইডেন্টিফিকেশন হয়ে গেছে। ডিসিজডের মাকে আমরা ডিটেইন করে রেখেছি আপনার জিজ্ঞাসাবাদের জন্য।' সঞ্জয় সঙ্গে সঙ্গে, 'ও শিয়োর,' বলে যেতে উদ্যত হতেই সত্যেন বাহুতুলে ওকে সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন। ওরা দুজন চেম্বারে প্রবেশ করে চেয়ারে বসতে বসতেই একটি মাঝবয়স্কা মহিলা উদ্ভ্রান্ত চোখে ঘরে প্রবেশ করে বললেন, 'আমার নাম নিনা বার্গ্যান্ডি। আমিই ...' সঞ্জয় হাতের ইশারায় বসতে বলে বলল, 'দেখুন মিসেস বার্গ্যান্ডি, আমরা আপনার মেয়ের ফ্লাইটের টিকিট চেক করে দেখেছি। উনি সিঙ্গল টিকিটেই গোয়া গেছেন। এখন সঙ্গে আর কেউ গিয়েছিল কিনা এ ব্যাপারে যদি আপনি আলোকপাত করতে পারেন।' নিনা বার্গ্যান্ডি বললেন, 'দেখুন, মেয়ে বড়ো হয়েছে। চাকরি-বাকরি করছে, স্বাবলম্বী হয়েছে। এখন কোনো বয়ফ্রেন্ড থাকাটা আমাদের সমাজের চোখে অপরাধ নয়। তবুও আজ পর্যন্ত কখনও ওকে কোনো বয়ফ্রেন্ড নিয়ে বাড়িতে আসতে দেখিনি। তাই কোনো পুরুষবন্ধুর সাথে গোপন সম্পর্ক রেখে থাকলেও আমার সে সম্পর্কে কিছু জানা সম্ভব নয়। প্রতি বছর এই কার্নিভালের সময়টায় ও গোয়ায় ছুটি কাটাতে যায়। যতদূর জানি একাই যায়। এবারও তাই গেছে ... অন্তত আমি এইটুকুই জানি।' সত্যেন বাহুতুলে জিজ্ঞাসা করল, 'আচ্ছা ম্যাক কিম্বারলি বলে কোনো বিদেশি বা অ্যাংলো ইন্ডিয়ান ব্যক্তির সঙ্গে আপনার মেয়ের পরিচয় আছে বলে কখনও শুনেছেন?' নিনা অবাক চোখে ঘাড় নেড়ে অসম্মতি জানালেন। সঞ্জয় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'ঠিক আছে, আপনি আসতে পারেন। আমরা আজ বিকেলেই ডেডবডি রিলিজ করে দেব।'

নিনা বার্গ্যান্ডি ঘর ছেড়ে বেরিয়ে যেতেই সঞ্জয় বাহুতুলেকে জিজ্ঞাসা করল, 'এই ম্যাক কিম্বারলির নামটা কোথা থেকে পেলেন?' সত্যেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই উত্তর দিল, 'ও হো, নানান ব্যস্ততায় আপনাকে বলাই হয়নি, গোয়ার টিরাকোল বিচ রেজর্ট,

যেখানে লোলা বার্গ্যান্ডির মৃতদেহটা আবিষ্কার করা হয়, সেখানকার লগবুকে সেদিনই দুপুর এগারোটা নাগাদ লোলার সঙ্গে এই ম্যাক্ কিম্বারলি নামের একটি লোকের এনট্রি সিগনেচার করা হয়েছে।' সঞ্জয় তীব্র ঔৎসুক্য নিয়ে জিজ্ঞাসা করল, 'সেখানে আর কী কী ইনফরমেশন্ পাওয়া যাচ্ছে?' সত্যেন বাহুতুলে বললেন, 'ন্যাশানালিটির কলামে লেখা আছে ইন্ডিয়ান, বয়স লেখা আছে তেত্রিশ আর অ্যাড্রেস লেখা আছে করোলবাগ, নয়াদিল্লি। অবশ্য আমরা সঙ্গে সঙ্গেই দিল্লি পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করে কনফার্মড হয়েছি যে অ্যাড্রেসটা ভুয়ো। ঐ নম্বরের কোনো বাড়িই করোলবাগে নেই।' সত্যেন কথা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গেই সঞ্জয় জিজ্ঞাসা করল, 'ম্যাক্ কিম্বারলির চেহারার বর্ণনা কিছু পাওয়া গেছে?' সত্যেন বাহুতুলের ঠোঁটের কোনায় অল্প হাসি খেলে গেল। তারপর একটু চিবিয়ে চিবিয়ে বলল, 'ইয়েস ... অ্যাভারেজ হাইট, পাঁচ ফুট সাত- আট ইঞ্চি। অ্যাভারেজ ওয়েট, পঁয়ষট্টি থেকে সত্তর কিলো। খুব ফেয়ার ... বিদেশিদের মতো, লাল চুল, গোঁফ এবং ভুরু ও হ্যাঁ, ক'টা চোখ।' সঞ্জয় 'রাইট!' বলে উত্তেজনায় টেবিল চাপড়ে বলল, 'এই কথাটা এতক্ষণ বলেননি কেন? দিস ইজ দ্য কনফার্মেশন। গত বছর জুহু বিচে যে মার্ডারটা হয়েছিল সেখানেও প্রোব্যাবল কালপ্রিটের বা খুনি-ধর্ষণকারীর চেহারার বর্ণনার সঙ্গে হুবহু মিলে যাচ্ছে।' সত্যেন বাহুতুলে একটু আত্মতুষ্টির সঙ্গে জোর দিয়ে বললেন, 'ইয়েস স্যার, এই কারণেই আমি এই মার্ডারটা সিরিয়াল কিলিং-এর অন্তর্ভুক্ত বলে মনে করছি। যদিও অবশ্য জুহু-র হোটেল থেকে যে নাম পাওয়া গেছিল তা হচ্ছে মারিও ম্যাসক্রিন হ্যস, ইন্ডিয়ান ... বয়স ছত্রিশ।' সঞ্জয় বলল, 'এটা তো লজিক্যালি প্রিজিউম করা যেতেই পারে যে মার্ডারার নাম বদলেছে। সে যাক এখন, এ পর্যন্ত কী কী গ্রাউন্ড ওয়ার্ক করেছেন বলুন তো?'

সত্যেন বাহুতুলে বললেন, 'আমি মার্ডারারের সম্ভাব্য চেহারার বর্ণনা দিয়ে রাজধানীর ভিসা অফিসে পাঠিয়েছিলাম, কিন্তু ওরা দুঃখপ্রকাশ করে জানিয়েছে যে বর্ণনা খুবই স্বল্প এবং শনাক্তকরণের অনুপযুক্ত।' সঞ্জয়কে নিঃশব্দে ঘাড় নাড়তে দেখে বাহুতুলে বললেন, 'আমি অবশ্য এতে দমে না গিয়ে আর্টিস্টকে নিয়ে গোয়ার স্পটে গেছি এবং উইটনেস্ ডেসক্রিপশন্ থেকে একটা ব্লাইন্ড স্কেচ্ করিয়ে এনেছি এবং আপনি শুনলে আশ্চর্য হবেন যে জুহুর মার্ডারটার পরে পরেই উইটনেস্ ডেসক্রিপশন্ থেকে যে ব্লাইন্ড স্কেচটা করানো হয়েছিল এটা কিন্তু তার সাথে বেশ মিলে যাচ্ছে,' বলে স্কেচ দুটো ফাইল থেকে বের করে সঞ্জয়ের সামনে টেবিলে রাখলেন। সঞ্জয় মিনিট পাঁচেক ধরে স্কেচ দুটো মিলিয়ে মিলিয়ে দেখে জিজ্ঞাসা করল, 'ভিসা অফিসে এই কপি দুটো পাঠিয়ে ওদের মতামত নিয়েছিলেন?' সত্যেন ঘাড় নাড়তে নাড়তে বললেন, 'হ্যাঁ

অবশ্যই, কিন্তু ওরা কনফার্ম করেছে যে এই জাতীয় চেহারার কোনো ফরেনার বছর দুয়েকের মধ্যে এদেশে প্রবেশ করেনি।' সঞ্জয় কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বলল, 'আমারও ধারণা লোকটি বিদেশি নয়। দেশীয় হবারই সম্ভাবনা বেশি।'

'প্রথমত, একজন বিদেশির পক্ষে এই বিশাল দেশের রাস্তাঘাট সম্পর্কে এত বিস্তৃত জ্ঞান থাকা খুব সহজ ব্যাপার নয়। সেক্ষেত্রে তাকে এদেশের রাস্তাঘাট চষে ফেলতে হয়েছে। আর খেলাল রাখবেন ভারতবর্ষ ইউরোপের আর পাঁচটা দেশের মতো আয়তনে ছোটো নয়, বরং বিশাল, সুতরাং ভারতবর্ষের রাস্তাঘাট চষে বেড়াতে এবং তা নখদর্পণে এনে ফেলতে যথেষ্ট সময় লেগে যাবে ... তা নিদেনপক্ষে তিন-চার বছর। এতটা দীর্ঘ সময় ভারতে থাকতে হলে তাকে ভিসা রিনিউ করতে হয়েছে ... যার অর্থ ধরা পড়ে যাওয়া বা ট্রেস আউট হয়ে যাওয়ার প্রভূত সম্ভাবনা। আর সে যদি তা না করে থাকে তাহলে এতদিনে তার ভিসা ল্যাপ্স হয়ে গেছে এবং যে-কোনোদিন সে অ্যারেস্ট হয়ে যেতে পারে। তা ছাড়াও টাকা-পয়সার সমস্যা একটা প্রধান সমস্যা। এতগুলো কঠিন সমস্যা নিয়ে কোনো বিদেশি এদেশে শুধু মনের আশ মিটিয়ে খুন করার জন্য থাকবে বলে মনে হয় না। তা ছাড়া একজন অপরাধকারীর পয়েন্ট অব ভিউ থেকে ভেবে দেখুন, সে তার অপরাধের জায়গাটা অন্যান্য সমস্যামুক্ত রাখার চেষ্টা করবে, যাতে তার উদ্দেশ্য খুব সহজে সফল হতে পারে। একটা অচেনা দেশে তার অবস্থাটা অনেকটা জল ছেড়ে ডাঙায় উঠে আসা মাছের মতো, এ অবস্থায় কামনা চরিতার্থ করার প্রবণতাটাই তার মনে আসাটা একটু কষ্টকল্পিত। আমার মনে হয় আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে পারি যে অপরাধকারী ভারতীয়ই।'

সত্যেন বাহুতুলে প্যান্টের পকেট থেকে সিগারেট আর লাইটার বের করে সৌজন্যবশত জিজ্ঞসা করলেন, 'এক্সকিউজ মি স্যার উড ইউ ...।' সঞ্জয় হাতের ইশারায় ওকে থামিয়ে দিয়ে বলল, 'শিয়োর, গো অ্যাহেড, বাট টেল মি, ডিড ইউ চেক দ্য ভিসিটার্স লিস্ট?' সত্যেন এক মুখ ধোঁয়া ছেড়ে বললেন, 'আমরা গত দু-মাসের ডাবলিং এয়ারপোর্টের এনট্রি লিস্ট দেখেছি। ম্যাক্ নয়, জন কিম্বারলি বলে একজন ব্রিটিশ ন্যাশানলের নাম সেখানে পাওয়া যাচ্ছে। তার বয়স ষাট। সঙ্গে স্ত্রী ছিল এবং অবশ্যই ভ্যালিড পাসপোর্টও ছিল। জন কিম্বারলি ন'দিন সস্ত্রীক গোয়ায় ছিলেন এবং গোয়া থেকে বম্বে হয়ে বিমানযোগে ইংল্যান্ডে ফিরে গেছেন।' একটু থেমে দম নিয়ে সত্যেন আবার বলতে শুরু করলেন, 'এ ছাড়া গত দুমাসে আমরা বম্বে থেকে গোয়ার বিমান, বাস ও জাহাজ যাত্রীদের নামের লিস্ট দেখেছি, সেখানেও ঐ নামে কাউকে পাওয়া যায়নি।' সত্যেন কথা শেষ করে একটা দীর্ঘশ্বাস ফেললেন। সঞ্জয় চুপ

করে রইল।

সত্যেন বাহুতুলে ছাইদানিতে আধখাওয়া সিগারেটের টুকরোটা গুঁজে দিতে দিতে আবার বললেন, 'লোলা বার্গ্যান্ডির হোয়েরাবাউটস্ ট্রেস করার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের নির্দেশমতো গোয়া পুলিশ আঞ্জুনা বিচের প্রায় সব কটা গেস্ট হাউসেই ব্লাইন্ড স্কেচ নিয়ে খোঁজ-খবর নেয়। ওখানে ঐ নাম বা চেহারার কোনো ব্যক্তি ওই গেস্টহাউসগুলোতে বোর্ডার হিসেবে ওঠেনি। অর্থাৎ আপাতত সব রাস্তাই ব্লাইন্ড অ্যালিতে গিয়ে শেষ হচ্ছে।' সঞ্জয় নিঃশব্দে ঘাড় নাড়ল।

লাঞ্চ শেষ করে অফিসে ফিরে আসার সঙ্গে সঙ্গেই সত্যেন হাসি হাসি মুখে জানালেন, 'স্যার, একটা সুখবর আছে। পানাজি পুলিশ এক্ষুনি খবর পাঠিয়েছে যে কালাঙ্গুট বিচের মিস্টার কেটার্স হোটেলে একজন বোর্ডার যে একটা কামরা নিয়ে কার্নিভালের সময়টার চারদিন ছিল তখন একটা বাইক ভাড়া নেয়। সে বাইকের ভাড়া না দিয়েই উধাও হয়েছে। চেহারার যা বর্ণনা পাওয়া যাচ্ছে তাতে আমাদের অপরাধীর সাথে হুবহু মিলে যাচ্ছে। হোটেলের লগবুকে অবশ্য অন্য নাম এন্ট্রি করা হয়েছে।' সঞ্জয় জিজ্ঞাসা করল, 'কী নাম রয়েছে?' সত্যেন বললেন, 'ম্যাকলে কলিন্স্।' সঞ্জয় জিজ্ঞাসা করল, 'ন্যাশ্যানালিটি কী?' সত্যেন বলল, 'ইন্ডিয়ান এবং অ্যাড্রেস নয়দিল্লি। অবশ্য এক্ষেত্রেও দিল্লি পুলিশের সাথে যোগাযোগ করে জানা গেছে যে ঐ অ্যাড্রেসটাও ভুয়ো।' সঞ্জয় ঠোঁট উলটে, কাঁধ ঝাঁকিয়ে হাল ছেড়ে দেওয়ার ভঙ্গি করল। সত্যেন সেদিকে হাসি হাসি মুখে কিছুক্ষণ তাকিয়ে থেকে তারপর বলল, 'বাট, দ্যেয়ার ইজ অ্যান ইন্টারেস্টিং সাইড স্টোরি। যে গোয়ানিজ লোকটি ঐ বাইক বা টু হুইলার ম্যাক বা ম্যাকলেকে ভাড়া দিয়েছিল তার বক্তব্য হল যে ওর ড্রাইভিং লাইসেন্স WB নম্বর দিয়েছিল ... অর্থাৎ পশ্চিম বাংলার নম্বর।' সঞ্জয় এবার রীতিমতো নড়েচড়ে বসল। তারপর সত্যেনের দিকে সোজাসুজি দৃষ্টি রেখে বলল, 'আমাকে ব্যাপারটা আর একটু ডিটেইলে বলুন তো দেখি।'

সত্যেন বাহুতুলে বলতে শুরু করলেন, 'দেখুন গোয়ায় টু হুইলার ভাড়া দেওয়ার সময় কোনো সিকিউরিটি বা ঐ জাতীয় কিছু হায়ারারের কাছ থেকে নেওয়া হয় না, কেবলমাত্র হায়ারারের লাইসেন্সটা দেখতে চাওয়া হয়। কখনও ওরা লাইসেন্স নম্বরটা টুকে রেখে দেয়। কখনও তাও করে না। এক্ষেত্রে টু হুইলারের মালিক ভাড়া দেওয়ার সময় লাইসেন্সটা এক ঝলক দেখেছে মাত্র, নম্বরটা টুকে রাখেনি। এক তারিখ সকালে সে সেন্ট্রাল পার্কিং লটে নিজের বাইকটা রাখা আছে দেখে প্রথমে ভাবে যে হায়ারার আশেপাশে কোথাও আছে। বিকেলে এসেও বাইকটা ঐ একই জায়গায় দাঁড় করানো

আছে দেখে তার কেমন সন্দেহ হয়। বাইকটা নাড়া চাড়া করে দেখে হ্যান্ডেল লক করা আছে। সে হোটেলে যায় এবং জানতে পারে যে বোর্ডার হোটেলের বিল মিটিয়ে কাল বিকেলেই চলে গেছে। অনেক খোঁজাখুঁজি করে সে এও জানতে পারে যে বোর্ডার হোটেলে নিজের ঘরেই বাইকের চাবিটাও ফেলে রেখে গেছে। নিজের প্রাপ্য টাকা উদ্ধার করতে গিয়ে হোটেলের লগবুকে হায়ারারের দিল্লির অ্যাড্রেস দেখে তার কেমন সন্দেহ হয়, কেন-না তার স্পষ্ট মনে আছে যে ড্রাইভিং লাইসেন্সে সে WB অর্থাৎ পশ্চিমবাংলার নম্বর দেখেছে। খবরটা এইভাবেই পাঁচ কান ঘুরে পানাজি পুলিশের কাছে পৌঁছেছে। সত্যেন আবার বেশ কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে বললেন, 'আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে যে মারিও ম্যসক্রিনহ্যসের যে অ্যাড্রেস আমার জুহুর হোটেল থেকে উদ্ধার করেছিলাম তাও ছিল কলকাতার।' সঞ্জয় সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়তে নাড়াতে বলল, 'বাহুতুলে, আমি মোটামুটি কনভিন্সড্, আমরা এখন ঠিক দিকেই এগোচ্ছি। আপনি যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ফিঙ্গার প্রিন্ট একসপার্টের রিপোর্টটা আনানোর ব্যবস্থা করুন।' সত্যেন বাহুতুলে একবার জিজ্ঞাসা করলেন, 'স্যার একবার গোয়ার স্পষ্ট ভিজিট করবেন নাকি? যদি কোনো অ্যাডিশ্যনাল ইনফরমেশন্ পেয়ে যান?' সঞ্জয় বলল, 'মনে হয় তার কোনো দরকার হবে না। আমার মনে হয় তার চেয়ে ম্যারিনা বিচ এবং গোপালপুর অন্-সি ভিজিট করা গেলে কাজ হতে পারে। যদিও আমার ধারণা দু-বছর আগে হওয়া মার্ডারগুলো সম্বন্ধে নতুন কোনো তথ্য পাওয়া যাবে না, তবুও একবার গিয়ে দেখতে ক্ষতি কী? আমি বিকেলের দিকে একবার আসছি,' বলে সঞ্জয় চেয়ার ছেড়ে উঠে পড়ল।

বিকেল পাঁচটা নাগাদ সঞ্জয় ডিআইজি-র (সিআইডি) অফিসে ইনস্পেকটার সত্যেন বাহুতুলের চেম্বারে প্রবেশ করে দেখল, বাহুতুলে কয়েকটা ফিঙ্গার প্রিন্ট স্যাম্পেল নিয়ে খুব মনোযোগ দিয়ে দেখছে। সঞ্জয় প্রবেশ করতেই বাহুতুলে এক গাল হেসে বলল, 'স্যার, উই আর অ্যাবস্যলুটলি অন দ্য রাইট ট্র্যক। ফিঙ্গার প্রিন্ট বলছে যে গোয়ার লোলা বার্গ্যান্ডির হত্যাকারী আর গত বছর জুহু বিচে প্রিয়া অরোরার হত্যাকারী একই ব্যক্তি।' সঞ্জয় বলল, 'আমি কলকাতা অফিসে টেলেক্স পাঠিয়েছি, যাতে ওরা পশ্চিম বাংলার সবকটা মোটর ভেহিকলস্ অফিসে যোগাযোগ করে আমাকে জানাতে পারে যে ঐ নামে কোনো লাইসেন্স হোল্ডার আছে কিনা। ওদের কাছ থেকে কোনো খবর আসতে আসতে অন্তত কাল বিকেল অথবা পরশু সকাল হয়ে যাবে।' একটু থেমে সঞ্জয় আবার বলল, 'তা ছাড়া আমি ডিআইজি (সিআইডি) মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদ রেঞ্জের কাছে ম্যরিনা বিচ ও গোপালপুর অন-সিতে হওয়া

খুনের ফাইলগুলো চেয়ে পাঠিয়েছি। সেগুলিও আগামী পরশুর আগে কোনোমতে পাওয়া যাবে না। সুতরাং অপেক্ষা করা ছাড়া উপায় নেই।' বাহুতুলে বললেন ডিআইজি অবশ্য বম্বে এবং পানাজিতে রেড অ্যালার্ট পাঠিয়ে দিয়েছেন যাতে শহর থেকে বেরিয়ে যাওয়া সব বাস, গাড়ি, ট্রেন এবং প্লেনে সাবধানতামূলক চেকিং করা হয়। এবং ঐ চেহারার বর্ণানার সাথে মিলে যাচ্ছে এমন ব্যক্তিকে অবিলম্বে আটক করে রাখা হয়। দিল্লিতেও একই মেসেজ পাঠানো হয়ে গেছে।'

সঞ্জয় অল্প হেসে বলল, 'এতে খুব একটা লাভ হবে বলে মনে হয় না। কেন-না অপরাধী এতদিনে বম্বে বা গোয়া ছেড়ে বেরিয়ে গেছে। তাকে এখানে পাওয়ার আর কোনো সম্ভাবনা নেই বললেই চলে। এ ব্যবস্থা ঘটনার পরের দিন থেকে চালু করলে তবুও একটা সম্ভাবনা ছিল।' তারপর কিছুক্ষণ চুপ করে থেকে আবার বলল, 'অবশ্য অপরাধী যদি সত্যি সত্যিই দিল্লির বাসিন্দা হয়ে থাকে তাহলে দিল্লিগামী বাস- ট্রেন থেকে তাকে উদ্ধার করার একটা ক্ষীণ সম্ভাবনা থাকলেও থাকতে পারে।' একটা লম্বা শ্বাস নিয়ে সঞ্জয় চেয়ার ছেড়ে উঠে জানালার সামনে এসে দাঁড়াল। বহু নীচে আলোকোজ্জ্বল বোম্বাইয়ের প্রশস্ত সড়ক। দুধারে গগনচুম্বী অট্টালিকার সারি। বিজলি আলোর বন্যায় কেমন যেন মায়াময়। সঞ্জয় পলকবিহীন সেদিকে বহুক্ষণ তাকিয়ে রইল। হঠাৎই অনেক ছোটোবলার একটা স্মৃতি তার চোখের সামনে ভেসে উঠল। মাঘ মাসের এক সন্ধ্যা। তার সর্বক্ষণের সঙ্গী ফজলের সঙ্গে সে গেছে লাক্ষা পিরের গোরস্থানে জোনাক দেখার জন্য। বাড়ি থেকে মাত্র দু-মাইল পথ। নদীর ধারে অসম্ভব নির্জন একটা জায়গা। ঘুটঘুটে অন্ধকার, বুনো জংলার গন্ধ নদীর ভেজা হাওয়ার সাথে মিলেমিশে একটা গা ছমছমে পরিবেশ সৃষ্টি করেছে। সেই নিস্তব্ধতা আর অন্ধকারের মধ্যে লক্ষ লক্ষ জোনাকি উড়ে বেড়াচ্ছে। সেখানে দাঁড়িয়ে থাকতে থাকতে ফজল ওর কানে প্রায় ফিশফিশ করে বলল, 'ঐ যে এক একটা জোনাকি দেখেছিস, ওটা এক একটা পিরের আত্মা। প্রতি রাতে তারা সব বেহেস্ত থেকে নেমে আসে নওগাঁও-এর লোকদের মুশকিল আসান করার জন্য। ভোর হলেই তারা আবার বেহেস্তে ফিরে চলে যায়।'

বছর সাতেক আগে একবার নওগাঁও গেছিল সঞ্জয়। এক অদ্ভুত টানে লাক্ষা পীরের গোরোস্থানে চলে গেছিল। নদীর ধারের সে জায়গাটাই আর নেই। একটা বড়োসড়ো মসজিদ গড়ে উঠেছে। তাকে ঘিরে চারধারে ফুল, ধূপকাঠি, চাদর-টুপির নতুন গজিয়ে ওঠা দোকান। জোনাকগুলো সব কোথায় হারিয়ে গেছে। শুধু উপচে পড়া লোকের ভিড়।

সঞ্জয়কে অনেকক্ষণ চুপচাপ দেখে সত্যেন বাহুতুলে চেয়ার ছেড়ে এগিয়ে এসে জিজ্ঞাসা করল, 'কেয়া বাত হ্যয় স্যার? বড়ে উদাস হো গয়ে?' সঞ্জয় যেন বাহুতুলের সংশয়টা ঝেড়ে ফেলার জন্যই বলল, 'কাছাকাছি কোনো বার থাকলে চলুন ঘুরে আসি।' সত্যেন অল্প হেসে বলল, 'চলুন।'

আটচল্লিশ ঘণ্টা পার হয়ে যাওয়ার পরও ঘটনা কোনো নতুন মোড় নিল না। বোম্বাই বা গোয়া পুলিশ কোনো নতুন তথ্য উদ্ধার করতে পারল না। দিল্লি পুলিশ নতুন করে জুহু বিচের ভিকটিম প্রিয়া অরোরার বাড়ি, অফিস, ক্লাব ইত্যাদি প্রায় সব জায়গাতেই খোঁজখবর নিল, কিন্তু কোনো একটি জায়গাতেও কিম্বারলি নামের বা ঐ ব্লাইন্ড স্কেচে পাওয়া চেহারার লোকের কোনো হদিস মিলল না।

বাহাত্তর ঘণ্টা পার হয়ে যাওয়ার পর কলকাতা থেকে এক চাঞ্চল্যকর তথ্য নিয়ে টেলেক্স এল, যাতে বলা হচ্ছে যে ম্যাকলে কলিন্স নামে জনৈক ব্যক্তির পশ্চিম বাংলার নম্বরে ড্রাইভিং লাইসেন্স আছে বটে, কিন্তু বছর তিনেক আগে তা হারিয়ে গেছে বলে মমিনপুর থানায় ঐ ব্যক্তি একটি জেনারল ডায়েরি করেন এবং তারপর থেকে ঐ ব্যক্তির নামে কোনো ডুপ্লিকেট ড্রাইভিং লাইসেন্স ইস্যু করা হয়নি। আরও জানা যাচ্ছে যে ম্যকলে কলিন্স দু-বছর আগে ভারতবর্ষ ছেড়ে চলে যান। সম্ভবত তিনি হংকং থেকে ওয়ার্কিং ভিসা পেয়েছিলেন। সঞ্জয় টেলেক্স মেসেজটা হাতে পেয়ে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে পড়ল, তারপর সত্যেনকে উদ্দেশ করে বলল, 'আমার আজই কলকাতা ফিরে যেতে হবে।' সত্যেন গম্ভীর মুখে মাদ্রাজ ও হায়দ্রাবাদ রেঞ্জ থেকে আসা কাগজপত্রে ভরা খাম দুটো সঞ্জয়ের দিকে এগিয়ে দিয়ে বলল, 'ওয়েল। কিপ ইন টাচ্। টিল দ্যন ...।' এয়ারপোর্টের রানওয়ে দিয়ে প্রায় ছুটেই বোম্বাই থেকে কলকাতাগামী ফাঁকা প্লেনটার সিটে উঠে বসতে বসতে সঞ্জয় অনুভব করল মস্তিষ্কের কোনো এক সুপ্ত কোষের মধ্যে একটা অ্যালার্ম ঘড়ি কখন যেন তাকে মৃদু সংকেত দিতে শুরু করে দিয়েছে। একটা আবছা ধুলোয় ঢাকা অবয়ব যেন স্মৃতির অতল অন্ধকার থেকে উঠে আসতে চাইছে ... পারছে না। সঞ্জয় চোখ বন্ধ করে ফেলল। মাটি থেকে পঁয়তাল্লিশ হাজার ফুট উচ্চতায় অ্যালার্ম ঘড়ির বিপ্ বিপ্ শব্দটা ক্রমশ তার হৃদস্পন্দনের শব্দকেও ছাপিয়ে যাচ্ছে। সঞ্জয় সোজা হয়ে উঠে বসে জানালা দিয়ে বাইরে তাকাল ... শুধু নিকষ কালো অন্ধকার।

।। তিন ।।

"A Characteristic of Libido which is important in life is its mobility, the ease with which it passes from one object to another. This must be contrasted with the fixation of libido to particular objects, which often persists through life."

ঘুম থেকে ধড়মড় করে উঠে বসল মৈনাক। 'মনিয়াদা','মনিয়াদা' করে কে যেন ডাকছিল। আধো ঘুম আধো চেতনার মধ্যে হঠাৎ ডাকটা তাকে বেশ নাড়িয়ে দিয়েছিল। মনে হচ্ছিল ঠিক যেন ওর ভাই কৃত্তির গলা। মৈনাক শ্বাসরোধ করা গলায় বিছানার মধ্যেই ছটফট করতে করতে ডেকেছিল, 'কৃত্তি, কৃত্তি তুই ছুটে ভেতরে চলে আয়। আমি জেগে আছি। আমি সজ্ঞানে আছি, কৃত্তি তুই এতদিন আমায় ছেড়ে কোথায় ছিলি ...?' কিছুক্ষণ মাত্র। তারপর বিড় বিড় করতে করতেই ওর চেতনাটা ধীরে ধীরে ফিরে এল। দুরন্ত হৃদস্পন্দনের মধ্যে সে মনে মনে বলল, 'আরে ধুর কোথায় কৃত্তি, সে তো আজ থেকে দীর্ঘ ত্রিশ বছর আগে মারা গেছে, ডিপথেরিয়ায়। তবে এ কার ডাক শুনছিল সে? মৈনাক ধড়মড় করে বিছানায় উঠে বসল। বুকটা অসম্ভব জোরে জোরে লাফাচ্ছে। মাথার ভেতরটা কেমন দপ দপ করছে। এত জোরে দপ দপ করছে যে মনে হচ্ছে এক্ষুনি বুঝি মস্তিষ্কের ভেতরে একটা মারাত্মক বিস্ফোরণ ঘটে গেছে।

মৈনাক কোনোরকমে হাত বাড়িয়ে মাথার কাছে শ্বেত পাথরের গোল টেবিলে রাখা কাচের গ্লাস টেনে কোঁত কোঁত করে জলটা খেয়ে শেষ করে ফেলল। শ্বাসরোধ

করা উত্তেজনাটা সে মুহূর্তে তার ইন্দ্রিয়গুলোকে এতটাই কাবু করে রেখেছিল যে সুদৃশ্য বেলজিয়ান কাটগ্লাসের কোস্টারটা মেঝেতে পড়ে ভেঙে টুকরো টুকরো হয়ে যেতেও তার সম্বিৎ ফিরল না। এক নিশ্বাসে জলটা খেয়ে মৈনাক হাত বাড়িয়ে গ্লাসটা যথাস্থানে রেখেই 'ওঃ মাগো' বলে বিছানায় গড়িয়ে পড়ল। কিছুক্ষণ চোখ বুজে পড়ে থাকার পর তার হৃদস্পন্দনটা ধীরে ধীরে শান্ত হয়ে এল।

স্বাভাবিক হতেই মৈনাকের মনে যে জিজ্ঞাসাটা উঁকি দিল তা হল, হঠাৎ করে এত বছর পরে তার মৃত ভাইয়ের ডাক শুনল কেন? কৃত্তির ডাক শোনার তো কোনো প্রশ্নই ওঠে না। কিন্তু ঐ সম্বোধনে তো তাকে আর কেউ ডাকে না। ঐ ডাকটা তার কাছে অনেক দিন অচেনা হয়ে গেছে। হঠাৎ দরজার দিকে তাকাতেই দেখল সকালের প্রথম আলোর সঙ্গে সঙ্গে দরজা দিয়ে উঁকি দিচ্ছে তার খাস চাকর রাখু। তক্ষুনি ব্যাপারটা বোধগম্য হল মৈনাকের। তাই তো, ঐ ডাকটা তো তার একদমই অচেনা নয়। রাখু আজও তাকে ঐ নামে ডাকে। তেরো-চোদ্দো বছর বয়স থেকে রাখু এই বাড়িতে আছে, মৈনাকের খাস চাকর হয়ে। মৈত্র পরিবারে রাখুরা বংশ পরম্পরায় গৃহভৃত্যের দায়িত্ব পালন করছে। রাখুর বাবাও মৈনাকের বাবার খাস চাকর ছিল। কৃত্তির তখন পাঁচ বছর বয়স। মৈনাককে সে ঐ নামে ডাকত। কৃত্তির ডাক শুনে শুনে রাখুও মৈনাককে 'মনিয়াদা' বলেই ডাকত। আজও ডাকে। কিন্তু কী আশ্চর্য! আজ রাখুর ঐ ডাকে মৈনাকের আধো তন্দ্রার মধ্যে চৌত্রিশ বছর আগের মৃত ভাইয়ের কথা মনে পড়ে গেল কেন? আপাতত অবশ্য মৈনাক ভাবনাটা মুলতবি রাখল।

বিরক্তি জড়ানো গলায় মৈনাক জিজ্ঞাসা করল, 'এই সাতসকালে ডাকছিস কেন?' রাখু জড়সড়ো হয়ে বলল, 'আজ কত্তাবাবুর মৃত্যুদিন। নিমতলা ঘাটে ঠাকুরমশাই পুজো করছেন। তোমাকে তর্পণের জন্য চলে যেতে বলেছেন। তাই ডাকছি।' মৈনাক উঠে বসল। মাথাটা এখনও ভারী-ভারী লাগছে। চোখটা অসম্ভব জ্বালা করছে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ও বিছানা ছেড়ে উঠে বাথরুমে ঢুকে গেল। মিনিট পনেরো পরে পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হয়ে বেরিয়ে এসে দেখল, রাখু মেঝে থেকে খুব যত্ন করে ভেঙে যাওয়া কাচের টুকরোগুলো কুড়িয়ে একটা পাত্রতে রাখছে। ওকে দেখে বলল, 'এখানেই চান করে নিলে? ঠাকুরমশাই যে বলেছিলেন গঙ্গাস্নান করতে হবে!' মৈনাক কোনো উত্তর দিল না। আরাম কেদারাটায় রাখা কোরা ধুতি আর উত্তরীয়টা গায়ে জড়িয়ে বলল, 'দেবুকে গাড়িটা বের করতে বলেছিস?' রাখু ঘাড় নাড়াতেই মৈনাক সিঁড়ি দিয়ে আস্তে আস্তে একতলায় নেমে গেল।

পুজো-আচ্চায় কোনোদিনই বিশেষ আগ্রহ ছিল না মৈনাকের। করতে হয়, বংশের

রীতি। পূর্বপুরুষের প্রতি দায়বদ্ধতা রক্ষা করতেই সে ঘাটে এসেছে। তবুও অনেকদিন পরে সকালবেলায় গঙ্গার ঘাটে এসে তার মনটা কেমন উদাস হয়ে গেল। আজ থেকে প্রায় চৌত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বছর আগে এমনই একটা শীত-শীত করা সকালে সে নিমতলা ঘাটে এসেছিল তার ভাইয়ের শবদেহ নিয়ে। সঙ্গে ছিলেন বাবা। এক কঠিন গাম্ভীর্য নিয়ে এই চাতালটায় বসেছিলেন। চোখ দুটো অসম্ভব শুকনো আর লাল। অদূরে মনো, রাখুর বাবা, ডুকরে ডুকরে কাঁদছিল আর বারবার কাঁধের গামছাটা দিয়ে চোখের অনর্গল অশ্রু ধারাকে সামলাচ্ছিল। মৈনাক দাঁড়িয়ে ছিল বাবার চেয়ে কিছুটা দূরত্বে, একটা থামে হেলান দিয়ে। জনা বিশেক আত্মীয়-অনাত্মীয় তার ভাই কৃত্তির নিথর, কঠিন দেহটার সর্বত্রে ঘি মাখিয়ে দিচ্ছিল। সে একবার সেদিকে তাকিয়েই আবার তাড়াতাড়ি চোখ ঘুরিয়ে নিল। শ্মশানে, পাশের মন্দিরটায় ক্রমাগত ঘণ্টা বেজে যাচ্ছে। স্নান সেরে নারী-পুরুষ, জোয়ান-বৃদ্ধ উঠে এসে মন্দিরে পুজো দিচ্ছে, অসংখ্য কাক খুব চঞ্চল হয়ে ডাকাডাকি করছে, পায়রাগুলো মন্দিরের ছাদের আলসেতে একবার বসছে আবার হঠাৎ দল বেঁধে কাছেই কোথাও উড়ে যাচ্ছে, ভিখিরিগুলোর আড়মোড়া ভেঙে সুখনিদ্রা ছেড়ে উঠে বসা, চোখ ধাঁধানো সূর্যটা— আরও কত কী! এসব দেখে অনেকক্ষণ বাদে মৈনাক যখন আবার ওর ভাইয়ের চিতার ওপর দৃষ্টি রাখল ততক্ষণে চিতাটা দাউ দাউ করে জ্বলছে। ওর ভাইয়ের ধবধবে সাদা শরীরটা আগুনের শিখায় চাপা পড়ে গেছে। মৈনাক থামের আড়াল ছেড়ে এগিয়ে এসে বাবার গা ঘেঁষে বসল। তারপর মাথাটা আলতো করে বাবার কাঁধে এলিয়ে দিল। বাবা ওর বাঁ হাতটা নিজের ডানহাতের মুঠোতে নিলেন। মৈনাক চোখ তুলে বাবার মুখের দিকে তাকিয়ে অবাক হয়ে গেল। চোখ দুটো কখন জলে ভরে গেছে। মৈনাক নিজে চোখ বন্ধ করে ফেলল।

'দাদাবাবু? দাদাবাবু?' মৈনাক চোখ খুলে তাকাল, দেবু ডাকছে। চিন্তার ধারাবাহিকতায় ছেদ পড়ল, দেবু বলল, 'ঠাকুরমাশাই ডাকছেন। তর্পণের সময় হয়ে গেছে।' মৈনাক উঠে দাঁড়িয়ে ঘাট দিয়ে নেমে গঙ্গার কোমর বা ডোবা জলে গিয়ে দাঁড়াল । ঠাকুরমশাই ওর করজোড় করা হাতে একমুঠো ফুল গুঁজে দিয়েই মন্ত্র পড়তে শুরু করে দিলেন। মৈনাক সে মন্ত্রোচ্চারণে মনোযোগ দেওয়ার চেষ্টা করল। পারল না। বারবার কৃত্তির মুখটা কেন যে ভেসে উঠছে!

সেদিন, ঠিক এইখানে, কৃত্তির চিতাভস্ম আর নাভিকুণ্ডটা ওরা ভাসিয়ে দিয়েছিল। মৈনাক সেদিকে নির্নিমেষ তাকিয়ে থাকতে থাকতে অনুভব করল, পেটের মধ্যে একটা মোচড়ানো ব্যথা। কিছু বুঝে ওঠার আগেই সে হড় হড় করে বমি করে

ফেলল। মনো এগিয়ে এসে ওকে ঘাটের ধারে বসিয়ে দিল। তারপর গঙ্গা থেকে দু-ঘটি জল ওর মাথায় ঢেলে দিয়েই ওকে টেনে নিয়ে গিয়ে গাড়ির ভেতর শুইয়ে দিল। তারপর আর ওর মনে নেই। যখন জ্ঞান ফিরল তখন দেখল নিজের খাটে শুয়ে আছে। জ্বরে গা পুড়ে যাচ্ছে।

তর্পণ শেষ হয়ে গেছে। ঠাকুরমশাই ওর গায়ে গঙ্গাজল ছিটিয়ে দিচ্ছে। মৈনাক শিউরে উঠে গা ঝাড়া দিল। তারপর ভেজা শরীর নিয়ে আস্তে আস্তে ঘাটের সিঁড়ি দিয়ে উঠে গিয়ে গাড়িতে বসল। গাড়ি ছেড়ে দিতেই ও অবসাদে চোখ বুজল। আবার কৃত্তির মুখটা ভেসে উঠছে। সত্যি, একটা মৃত্যু ওর জীবন বস্তুতপক্ষে পুরো মৈত্র পরিবারেরই কেমন যেন সমাপ্তি সূচিত করল।

রায়বাহাদুর জগৎনারায়ণ মৈত্র এ পরিবারের প্রথম সিদ্ধপুরুষ। আদি বাসস্থান, দক্ষিণ রাঢ় অঞ্চলের কোনো এক অখ্যাত গ্রাম ... শিমুলিয়া। ষোলো বছর বয়সে কলকাতায় আসেন ভাগ্যান্বেষণে। ভাগ্যলক্ষ্মী তাকে কখনও হতাশ করেননি। তার প্রথম ব্যবসা চামরের। তারপর নুন আর মশলা। লব্ধ মুনাফা থেকে তিনি দমদম, বরানগর, বনহুগলির বিস্তীর্ণ এলাকা কিনে নিতে শুরু করেন। তারপর বরানগরের প্রাসাদতুল্য গৃহ নির্মাণ করেন। ইংরেজ সরকারের কাছ থেকে রায়বাহাদুর উপাধিটা প্রায় অনায়াসেই এসে গেছিল।

তিনি যখন ইহলোকের মায়া ত্যাগ করেন ছেষট্টি বছর বয়সে, তখন তার একমাত্র পুত্র নরনারায়ণ মৈত্র কাঁচা পাটের ব্যবসায় পূর্বভারতের একচ্ছত্র অধিপতি। দমদম, বরানগর আর বনহুগলি মিলিয়ে বাসগৃহের সংখ্যা দাঁড়িয়েছে বত্রিশটা। রায়বাহাদুর পদবিটা বংশগত করতে তারও কোনো অসুবিধা হয়নি। তার দুই পুত্র ইন্দ্রনারায়ণ আর অগ্নিনারায়ণের ব্যবসায় হাতেখড়ি হয় খুব অল্প বয়সে। ইন্দ্রনারায়ণ যেখানে পিতৃদেবের পাটের ব্যবসায় মনোনিবেশ করেন, সেখানে অগ্নিনারায়ণ দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের বাজারে ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির অন্যতম বৃহৎ এনলিস্টেড কন্ট্রাকটার-কাম-সাপ্লায়ার হিসেবে নিজেকে প্রতিষ্ঠিত করে ফেলেন। কিন্তু বরানগরের মৈত্র পরিবারের উত্থানের কাহিনি এখানেই শেষ।

১৯৪৯ সালের আগস্ট মাসে এক বিমান দুর্ঘটনায় অগ্নিনারায়ণ নিহত হন। তার শরীরের একটা পোড়া মাংস টুকরোও খুঁজে পাওয়া যায়নি। এর ঠিক ন'মাস পরে পুত্রশোকে মুহ্যমান রায়বাহাদুর নরনারায়ণ মৈত্র হৃদরোগে আক্রান্ত হয়ে নিজ গৃহে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। এরও ঠিক দু'সপ্তাহ পরে নিহত অগ্নিনারায়ণের স্ত্রী এক পুত্রসন্তানের জন্ম দিতে গিয়ে দেহত্যাগ করেন। ইন্দ্রনারায়ণ বিবাহের অষ্টম বর্ষেও নিঃ

সন্তান ছিলেন। জন্মাবস্থায় পিতৃ-মাতৃহীন ভ্রাতুষ্পুত্রকে তিনি ও তার স্ত্রী নিজ সন্তান হিসেবে গ্রহণ করে পালন করতে শুরু করেন। পুত্রের নামকরণ হয় মৈনাক মৈত্র। শিশু মৈনাক যখন তার জীবনের প্রথম বর্ষটি সম্পন্ন করল ততদিনে বিশাল জে. মৈত্র অ্যান্ড কোম্পানির গণেশ উলটে গেছে। ব্রিটিশ ইন্ডিয়ান আর্মির এনলিস্টেড কন্ট্রাকটার-কাম সাপ্লায়ার মেসার্স জে. মৈত্র অ্যান্ড কোম্পানি তার বাজার হারিয়ে ফেলে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শেষ যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই। প্রয়োজন ছিল অন্য ব্যবসায় অর্থলগ্নি করে অবস্থা সামাল দেওয়া। কিন্তু ব্যবসায় অত্যন্ত চৌকস হওয়া সত্ত্বেও অগ্নিনারায়ণ আশ্চর্যজনকভাবে এ বিষয় সম্পূর্ণ উদাসীন হয়ে রইলেন। তিনি যেন খানিকটা ইচ্ছে করেই একটু একটু করে নিজের তৈরি ব্যবসাটাকে ধ্বংসের দিকে ঠেলে দিলেন। লালদিঘির উলটো দিকে অবস্থিত স্টিফেন হাউসের বিশাল চোখ ধাঁধানো অফিসটা আস্তে আস্তে জৌলুস হারিয়ে, ঝুল-কালি পড়ে হতদরিদ্র সরকারি অফিসের চেহারা নিল। অনিয়মিত মাইনে, আর্থিক দৈন্য দেখে কিছু অফিস কর্মী ইস্তফা দিয়ে দিলেন। বাকিরা তাদের বকেয়া আদায়ের জন্য ট্রেড ইউনিয়নের শরণাপন্ন হলেন। অফিসে তালা ঝুলল এবং শেষমেশ জে. মৈত্র অ্যান্ড কোম্পানি নিলাম হয়ে গেল ১৯৫১ সালে।

ঠিক পাঁচ বছর ছ'মাস বয়সে যখন মৈনাক হিন্দু স্কুলের ক্লাস ওয়ানে ভরতি হয়েছে তখন ইন্ডিয়ান টেনান্সি অ্যাক্টের জাঁতাকলে পড়ে ইন্দ্রনারায়ণ প্রায় ছাব্বিশটি বাড়ির মালিকানা একরকম খুইয়ে বসে আছেন। নতুন আইনের সাহায্য নিয়ে ঐসব বাড়ির ভাড়াটেরা এক পয়সা ভাড়া না দিয়ে, দিব্যি মৌরসি পাট্টা গেড়ে বসে আছে। মহামান্য ভারতীয় আদালত এবং জনগণের আইন রক্ষকদের এই অন্যায়ের প্রতি উদাসীন না হয়ে উপায় ছিল না। ফলে প্রাচুর্য ফুরিয়ে অনটন, তারপর দৈন্য মৈত্র পরিবারের একটা ইটকেও বাদ রাখল না। ১৯৫৯ সালের কার্তিক মাসে যখন ইন্দ্রনারায়ণের স্ত্রী একটি পুত্রসন্তানের জন্ম দিলেন তখন আনন্দ বা অসন্তোষের কোনোটাই তেমনভাবে দেখা দিল না মৈত্র পরিবারে। মৈনাক তখন তার জীবনের নবম বর্ষে পা রেখেছে।

'স্যার, স্যার!' মৈনাক খুব আস্তে আস্তে চোখ খুলে গাড়ির সিটে সোজা হয়ে বসতে বসতে দেখল গাড়িটা বাড়ির পোর্টিকোতে এসে দাঁড়িয়েছে। দেবু দরজাটা খুলে দাঁড়িয়ে তাকে ডাকছে। মৈনাক গাড়ি থেকে নেমে খুব ধীর পায়ে সিঁড়ি ভেঙে ওপরে উঠতে থাকল। রাখু ব্যস্ত পায়ে উঠে এসে প্রায় ফিশফিশ করে করে বলল, 'উকিলবাবু অনেকক্ষণ এসে বসে আছেন। অনেক সব দরকারি কাজ আছে বললেন।' মৈনাক কোনো প্রত্যুত্তর না করে সেরকমই ধীরে পায়ে নেমে এসে বাইরের ঘরে

ঢুকল।

পারিজাত বসু মল্লিক, বার-অ্যাট-ল, একজন পঞ্চাশোর্ধ্ব সম্ভ্রান্ত চেহারার মানুষ। কলকাতার অন্যতম নামকরা সলিসিটার ফার্ম 'মল্লিক অ্যান্ড মল্লিক'-এর তিনি দ্বিতীয় গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তি এবং এক-তৃতীয় অংশীদার। জে. মৈত্র অ্যান্ড কোম্পানির সময় থেকে সুদীর্ঘকাল ধরে মল্লিকরা বংশানুক্রমিকভাবে মৈত্র পরিবারের সুহৃদ, শুভানুধ্যায়ী এবং আইন বিষয়ক মন্ত্রণাদাতা। পারিজাত মৈনাককে নিজের ছোটো ভাইয়ের মতোই স্নেহ করতেন। আজও তার কোনো পরিবর্তন হয়নি।

মৈনাক ঘরে ঢুকতেই পারিজাত 'আরে এসো এসো' বলে মৈনাকের একটা হাত নিজের হাতে নিয়ে সোফায় পাশে বসালেন। তারপর হাসি হাসি মুখে বললেন, 'দিল্লি থেকে তো চারদিন হল ফিরেছো শুনলাম। তো কাজকর্ম কেমন হল বল!' মৈনাক খুব নিরুৎসাহের স্বরে বলল, 'তেমন একটা এনকারেজিং কিছু নয়। ঐ এক রকম আর কী।' পারিজাত তবুও খুব উৎসাহিত হয়ে জিজ্ঞাসা করলেন, 'মিটসুই-এর সঙ্গে কী কথা হল বল।' মৈনাক পাশ কাটানোর মতো করে বলল, 'বলব বলব। কাল আপনার চেম্বারে গিয়ে একদম ডিটেইলে সব আলোচনা করব। আজকে এই সব তর্পণ-টর্পণ করে এসে একদম টায়ার্ড লাগছে।' পারিজাত সঙ্গে সঙ্গে বললেন, 'ও তাহলে আজ থাক। কালই বরং বসা যাবে। তো কখন আসছো?' মৈনাক বলল, 'অন্যান্য কিছু কাজ আছে। সেগুলো সেরে মনে হয় চারটে নাগাদ পৌঁছে যাব।' পারিজাত 'ঠিক আছে, ঠিক আছে,' বলে সোফা ছেড়ে উঠতে উঠতে বললেন, 'জয়া ফোন করেছিল, বলছিল মণিদা দিল্লিতে এল আর আমার বাসায় একটিবারের জন্য এল না!' মৈনাক সৌজন্যবশত হেসে বলল, 'আসলে ছিলামই তো মোট চারদিন। কাজ সেরে আর সময় হয়ে ওঠেনি।' পারিজাত সায় দিলেন, 'হ্যাঁ, আমিও তাই বললাম। আচ্ছা, বনহুগলির নোনাতলার জমিটা প্রোমোটারদের দেওয়ার ব্যাপারে যাবতীয় কাগজপত্র তৈরি করে দিয়ে গেলাম। দেখে সই-সাবুদ করে আমার অফিসে পাঠিয়ে দিয়ো।' একটু থেমে বললেন, 'ওরা ফাইনালি চার কোটি দিচ্ছে, অবশ্য তিনটে ইনস্টলমেন্টে। পেপারগুলো একটু যত্ন নিয়ে পড়ে দেখো।'

পারিজাতের দেওয়া কাগজের গোছাটা ধরে মৈনাক কিছুক্ষণ ভাবলেশহীন মুখে দাঁড়িয়ে রইল। তারপর কাগজের গোছাটা আলতো করে সোফায় ছুড়ে দিয়ে অবসন্ন পায়ে সিঁড়ি দিয়ে উঠতে শুরু করল। লোলার বিস্ফারিত দু-চোখ, অল্প ভেজা ঠোঁট, তার দশ আঙুলের লৌহ কঠিন আবরণে লোলার গলা হঠাৎই মৈনাকের চোখের সামনে আস্তে আস্তে ভেসে উঠতে শুরু করল। মৈনাক শিউরে উঠে গা ঝাড়া দিল।